2000

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ❑ ১১তম ও ১২তম সংখ্যা

১৫ ডিসেম্বর, ২০০০ ইসাব্দ

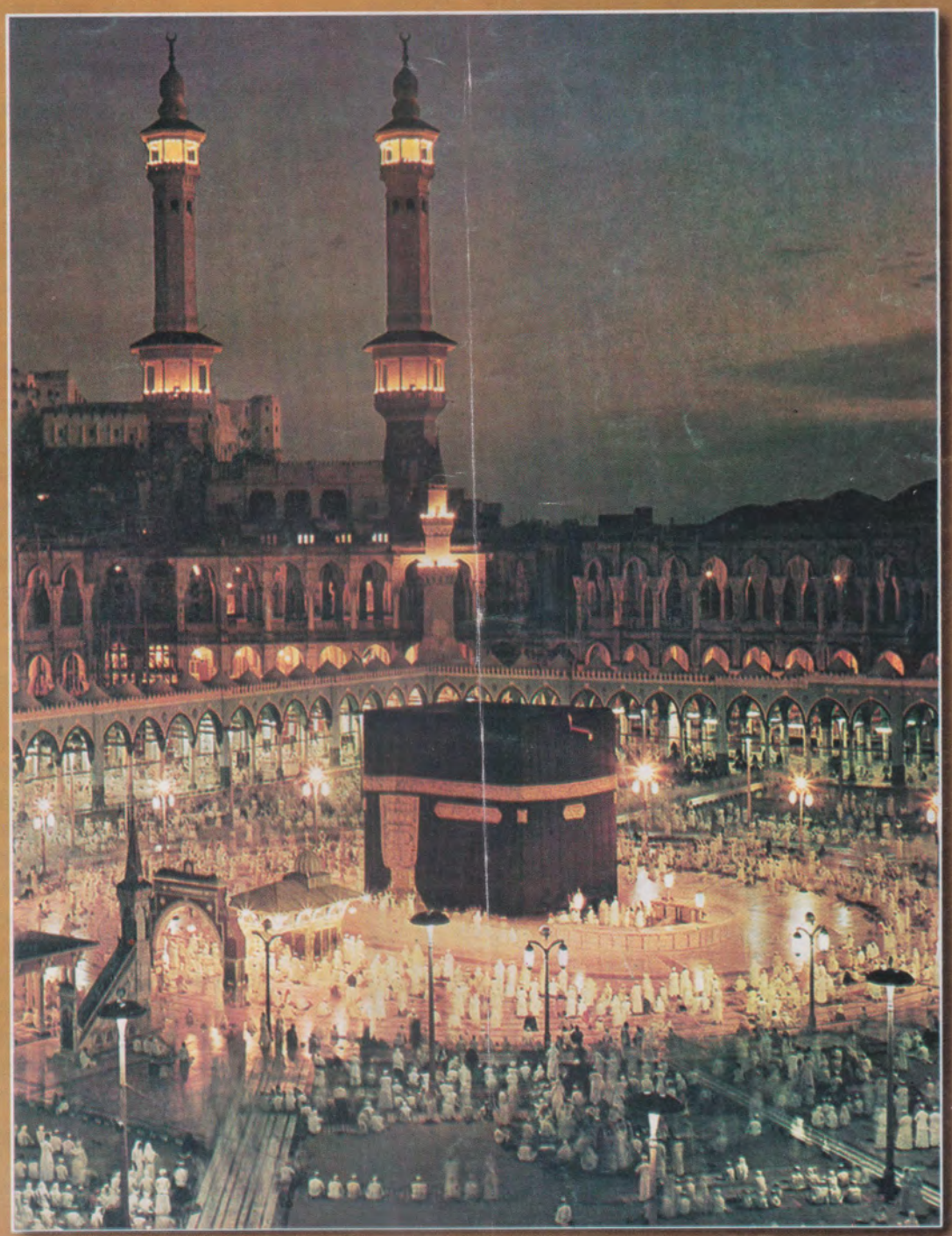

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

কাদিয়ান জলসা সালানা-২০০০ইং এ বাংলাদেশী আহমদী
জনাব মোহাম্মদ এহ্সানুল হাবিব জয় বক্তব্য রাখছেন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সিঙ্গাপুরে বাংলাডেস্ক ইনচার্জ বাংলাদেশী আহমদী ফকীর আব্দুস সাত্তার

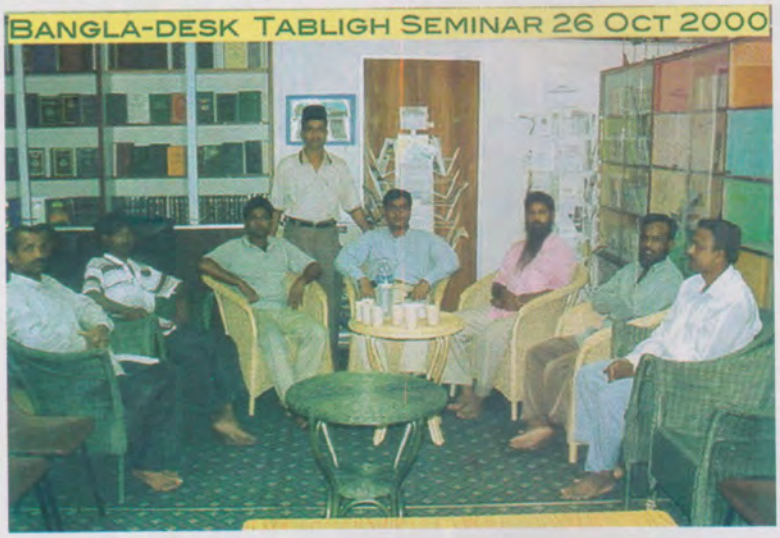

সিঙ্গাপুর জামাতে বাংলাডেস্ক আয়োজিত তবলীগি সভা - ২৬ অক্টোবর ২০০০ইং

ইশাআতে ইসলাম বা ইসলাম প্রচার ফান্ডে অংশ নিন !

আল্লাহ্তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের জন্যে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ হিসেবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে যথাসময়ে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর (আঃ) মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের লক্ষ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খেলাফতের অধীন 'বায়তুল মাল'। ইহাকে শক্তিশালী করার জন্যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও তাঁর খলীফাগণ (রাঃ) প্রবর্তন করেছেন বিভিন্ন চাঁদার। আজকে ইশাআতে ইসলাম ফান্ডের আর্থিক কুরবানীর দু'টি খাত সম্বন্ধে জামাতের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো ঃ

❑ **ব্যাংক সুদ** - বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত নন এমন লোক খুবই বিরল। ব্যাংকের সাথে লেন-দেন করলে ব্যাংক সুদ আদান-প্রদান করে থাকে। ইসলামে 'সুদ' দেয়া বা নেয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্যে বিষয়টি বড়ই নাজুক। সে সুদ না নিতে পারে আর না ব্যাংককে দিতে পারে অথচ সুদ ব্যতিরেকে বর্তমানে চলা খুবই দুষ্কর। তাই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) মুসলমানকে বিশেষ করে আহমদী মুসলমানকে এ সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ বাত্লিয়ে দিয়েছেন, আহমদীরা যেন ব্যাংক-সুদের অর্থ জামাতের 'ইশাআতে ইসলাম ফান্ডে' জমা করে দেন আর এ অর্থ যেন কেবল জামাতের বই-পুস্তক ছাপানোর কাজেই ব্যয় হয়।

❑ **ঈদ ফান্ড** - প্রত্যেক জাতির ঈদ বা আনন্দ খুশীর ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের 'ক্রিসমাচ' হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ইত্যাদি। তেমনি মুসলমানদের জন্যে রয়েছে 'ঈদুল ফিতর' 'ঈদুল আযহা'। অন্যান্য জাতি তাদের ঈদ বা খুশীর দিনে অযথা অর্থ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু অযথা ব্যয় করা ইসলামে নিষেধ করে ইসলাম খরচাদির ব্যাপারেও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর জামাতকে তবলীগ তথা আল্লাহ্র পথে মানুষকে ডাকার কাজে বেশী আনন্দ পাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আহমদীদের সবচে' বড় আনন্দ আল্লাহ্র নামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় এবং তাঁর প্রেরিত নবী (সঃ) কর্তৃক আনীত ধর্ম ইসলামের প্রচারে নিহিত। এজন্যে আহমদী জামাতের সৃষ্টি-লগ্ন থেকে এর প্রবর্তক (আঃ) আহমদীদেরকে ইশাআত তথা ইসলামের প্রচার কার্যে প্রত্যেক ঈদে 'ঈদ ফান্ড'-এ চাঁদা দেবার জন্যে তাগিদ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে আহমদীরা প্রত্যেকে এ ফান্ডে এক টাকা করে চাঁদা দিতেন। এখন যেহেতু প্রয়োজনও বেড়ে গেছে আর টাকার মূল্যমান খুবই কমে গেছে তাই ঈদের দিনসমূহে 'ঈদ ফান্ডে' বেশী বেশী করে চাঁদা দেবার জন্যে আহমদী ভাই-বোনকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা ঈদের দিনে 'তকবীর' পাঠ করার সাথে সাথে যাতে সারা বিশ্বে আল্লাহ্র নামের শ্রেষ্ঠত্ব যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাতেও অংশ নিতে পারি।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৩ বর্ষ ॥ ১১তম ও ১২তম সংখ্যা

১ পৌষ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ ১৭ রমযান ১৪২১ হিঃ কাঃ

১৫ ফাতাহ্ ১৩৭৯ হিঃ শাঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০০০ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ ভারত টাঃ ২০০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

প্রকৃত ঈদের দিনের প্রতীক্ষায়

আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতর, মহান বিজয় দিবস ও হিজরী শামসী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। সকলের জন্যে এগুলো কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসুক।

পবিত্র মাহে রমযানের রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের দিনগুলো একে একে চলে যাচ্ছে আর পবিত্র ঈদুল ফিতরের শওয়ালের এক ফালি ঈদের-বাঁকা চাঁদ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌কে বলবে, আস, ঈদ করো, আনন্দ-স্ফূর্তি করো। অথচ আনন্দ-স্ফূর্তি কীসের তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ আনন্দ-স্ফূর্তি কি নতুন জামা-কাপড় পরার আর সেমাই-জর্দা খাওয়ার, রমযানের বোঝা আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছে সে জন্যে। নাকি বড় লোকেরা ভাল ভাল দামী-দামী কাপড়-চোপড় পরে ঈদের খুশীতে ভরপুর হয়েছে আর কতগুলো লোক নগ্ন দেহে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে আর বলছে মা গো! খাবার দিবেন? ফেত্‌রা দিবেন– এজন্যে? নাকি এজন্যে যে, পবিত্র আরব ভূমি ইহুদী নাসারা কর্তৃক দলিত-মথিত হয়েছে, অথবা প্যালেষ্টাইনে মুসলমানগণ ইহুদী কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছে বা মুসলমানগণ আপোষে লেবানন আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানে লড়ছে আর ভাই ভাই-এর রক্তে খুশীতে আটখান হচ্ছে? খুব গভীরভাবে ভাবতে গেলে এ খুশী কি এ রকম নয় যে, কারও ঘরে মৃত পড়ে রয়েছে আর তারা আনন্দ স্ফূর্তিতে মশগুল?

'ঈদ' অর্থ যে খুশী বার বার আসে– হযরত ঈসা (আঃ)-এর জাতির জন্যে দু'বার এসেছিল। প্রথমতঃ 'আওয়ালীন'দের জন্যে, যারা প্রায় তিন শতাধিক বছর ঈমানের সম্পদকে রক্ষা করার জন্যে মাটির গুহায় কঠোর জীবন-আসহাবে কাহাফের জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরাও নিঃসন্দেহে একটা ঈদের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। 'আখেরীন'দের মধ্যে অর্থাৎ রোমান সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে (সূরা মায়েদা-১১৫) খৃষ্টানরা ঈদ উপভোগ করতে থেকেছে। দুনিয়াতে প্রভুত্ব বিস্তার করে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করেছিল। এমনকি সারা দুনিয়ার রিযকের ভান্ডার অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত 'রুটির পাহাড়ে'র মালিক বনে তারা এক প্রকার ঈদের আস্বাদন লাভ করেছিলো।

ইসলামের সপ্তম ও অষ্টম শতকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মুসলমানগণ এক প্রকার ঈদ আস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু 'ফাইজে আওয়াজের' (বক্র-পথভ্রষ্টতা) যুগে তারা ঈদ থেকে বঞ্চিত হয়। 'মুহাম্মদী মসীহ্' (আঃ)-এর যুগে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় 'খেলাফতে' 'আলা মিন হাজিন নবুওয়ত'-এর পদ্ধতিতে খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুনরায় মুসলমানগণ ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করবে বলে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে জ্ঞাত হওয়া যায়। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে সে কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। বিশ্ব মুসলিম যত শীঘ্র সে খেলাফতকে গ্রহণ করে তাদের অনৈক্য দূর করে ঐ এলাহী কর্মকান্ডের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবে তত শীঘ্র তারা সেই প্রতিশ্রুত 'প্রকৃত ঈদ'কে প্রত্যক্ষ করবে এবং দুনিয়াতে তখন পুনরায় আল্লাহ্‌তাআলার রাজত্ব আবার সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন ধর্ম বলতে ইসলামকেই বুঝাবে ও নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে। আমরা সেই প্রকৃত ঈদের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

–নির্বাহী সম্পাদক

অনিবার্য কারণে ১১ ও ১২তম সংখ্যাদ্বয় একত্রে প্রকাশ করতে হচ্ছে। ৯ ও ১০ সংখ্যাদ্বয়ও একই কারণে একত্রে বের করতে হয়েছিলো। পাঠক-পাঠিকাদের এ অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা হওয়ার জন্যে আমরা দুঃখিত।

–নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস ঃ রোযার মাহাত্ম্য	ঃ	
❑ অমৃত বাণী ঃ নামায প্রতিষ্ঠা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মুহাম্মদ ফজলুলু করীম মোল্লা	৪ ও ১২
❑ জুমুআর খুতবা ঃ রমযানের শেষ দশক ও দোয়ার মাহাত্ম্য হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫-১২
❑ ঈদুল ফিতরের খুতবা ঃ তিনটি ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩-১৬
❑ কবিতা ঃ অবাধ্য কণ্ঠস্বর	ঃ জনাব এম, এ, আউয়াল	১৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা বশীরুর রহমান	১৭-২২
❑ কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মি'রাজ	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২২-২৪
❑ ঈদের দিনে করণীয় – মোহতরম মাওলানা আব্দুল মাজেদ তাহের, লন্ডন	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৫-২৬
❑ যিক্‌রে হাবীব	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আহসান উল্লাহ্ সিকদার (মরহুম)	২৭-২৮
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৯-৩০
❑ হোমিওপ্যাথি ঃ সদৃশ বিধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৩১-৩২
❑ আমাদের চাঁদা	ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৩-৩৬
❑ মাহে রমযানে রোযা রাখার অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য	ঃ জনাব আমীর মাহ্‌মুদ ভূঁইয়া	৩৭-৪০
❑ ছোটদের পাতা ঃ মিনহাজুত্‌তালেবীন (সত্য সাধকদের রাজপথ) মূল ঃ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৪১
❑ এমটি এ ডাইজেস্ট	ঃ সংকলন - আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারিক	৪২-৪৩
❑ আনসারুল্লাহ্‌র কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন	ঃ	৪৪
❑ কাদিয়ান সফর ও কিছু ব্যক্তিগত কথকতা	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়	৪৫
❑ প্রশ্ন ও উত্তর	ঃ নির্বাহী সম্পাদক	৪৬
❑ সংবাদ	ঃ	৪৭

প্রচ্ছদ ঃ মক্কা মুয়ায্‌যমায় পবিত্র কা'বা গৃহ।

ঈদুল ফিতর ও বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

আসছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে দেশবাসীকে বিশেষ করে আহমদী ভাইবোনদেরকে জানাই ঈদ মোবারক ও ঈদের শুভেচ্ছা। এ ঈদ সকলের জন্যে বয়ে নিয়ে আসুক শান্তি ও স্বস্তির পয়গাম। ঈদের আনন্দ ও খুশীতে সকল গৃহ হোক ভরপুর।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যেও আমি আমার প্রিয় দেশবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা। আমরা আমাদের দেশের সর্বস্তরের লোকের সার্বিক কল্যাণের জন্যে দোয়া করি এ দিনে।

মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

আহমদী ডাক্তারগণ জীবন ওয়াকফ করুন

আফ্রিকায় আমাদের জামাত কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে আহমদী ডাক্তারদের প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশের আহমদী ডাক্তারদের (যারা MBBS বা BDS পাশ) দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে। যারা নুসরৎ জাহাঁ স্কীমের অধীনে জীবন ওয়াকফ (সারা জীবন / পাঁচ বছর / তিন বছর) করতে চান তাদেরকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে সেক্রেটারী মজলিসে নূসরৎ জাহাঁ পাকিস্তান-এর নিকট আবেদন করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, যাদের পরিবার রয়েছে তারা ৫ বছরের জন্যে ওয়াক্‌ফ করতে পারেন। আগামী ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে দরখাস্ত Bio Data সহ অত্র অফিসে পৌছুতে হবে।

মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আ'রাফ-৭

১৯। তিনি বললেন, 'তুমি বের হয়ে যাও এখান থেকে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়। তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে আমি নিশ্চয় তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করবো।'

২০। 'এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখানে তোমরা খুশীমত[৯৫৬] আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না,[৯৫৭] অন্যথায় তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

২১। কিন্তু, শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যেন সে (শয়তান) তাদের লজ্জার বিষয়াবলী[৯৫৭-ক] যা তাদের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল, তা তাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়, এবং সে বললো, 'তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এই বৃক্ষ থেকে শুধু এই জন্য নিষেধ করেছেন পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হয়ে যাও অথবা অমর হয়ে যাও।'

২২। এবং সে তাদের নিকট কসম খেলো (এই বলে), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী'।

২৩। অতঃপর, সে ধোঁকা দিয়ে উভয়ের অধঃপতন ঘটালো। তারপর যখন তারা ঐ বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করলো, (তখন) তাদের লজ্জার বিষয়াবলী[৯৫৮] তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়লো। তখন তারা উভয়েই জান্নাতের পাতাসমূহের[৯৫৯] দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। এবং তাদের প্রভু তাদেরকে (এই বলে) ডাকলেন, 'আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করি নি এবং তোমাদেরকে বলি নি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু ?'

৯৫৬। এর দ্বারা বুঝা যায়, কেবল দৈহিক বা আত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ বস্তু ব্যতীত সকল বস্তু বিধিসম্মত।

৯৫৭। "নিষিদ্ধ বৃক্ষ" দ্বারা এ-ও বুঝানো হতে পারে যে, আদম (আঃ) ও তার স্ত্রীকে যে আদেশ দ্বারা আল্লাহ্‌তাআলা বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে বারণ করেছিলেন তা-ই ছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষ। কুরআনে (১৪ঃ২৫) ভাল কথাকে "ভাল বৃক্ষের" সঙ্গে এবং মন্দ কথাকে "মন্দ বৃক্ষের" সাথে তুলনা করা হয়েছে (১৪ঃ২৭)।

৯৫৭-ক। যখন অসৎ চিন্তা মানুষকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে, তখন তা তার দুর্বলতাসমূহকেও তার নিকট প্রকাশিত করে থাকে।

যে স্থানে হযরত আদম (আঃ)-কে বাস করতে বলা হয়েছিল 'কুরআন করীমে' তাকে রূপকভাবে "জান্নাত" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, পরবর্তী বর্ণনাতেও উক্ত 'রূপক অর্থ' ব্যবহৃত হয়েছে এবং হযরত আদম (আঃ)-কেও যে বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছিল, উক্ত বৃক্ষ ছিল কোন বংশ বা গোত্র যার লোকদের নিকট থেকে তাঁকে দূরে থাকতে আদেশ করা হয়েছিল। কারণ সেই গোত্রের লোকেরা তাঁর শত্রু ছিল এবং তারা তাঁর ক্ষতি সাধনে সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাতো।

৯৫৮। "সাওয়াতুন" অর্থ যে কোন মন্দ, অশুভ, অসাধু, অনুচিত বা জঘন্য কথা বা অভ্যাস বা কর্ম যা লোকে গোপন রাখতে পসন্দ করে অথবা লজ্জা, নগ্নতা (লেইন)। "সাওয়াতুন" শব্দ এখানে "লজ্জার বিষয় বা বস্তু" অথবা "দুর্বলতা" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ কোন মানুষের নগ্নতা তার নিজের নিকট গোপন নয়। বস্তুত হযরত আদম (আঃ)-এর বিশেষ কোন দুর্বলতা তাঁর নিকট অজানা ছিল এবং তাঁর শত্রুরা যখন প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে নিরাপদ অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে বসলো, তখনই তিনি তাঁর দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু দুর্বলতা তখনই তার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে, যখন সে চাপে পড়ে অথবা যখন সে প্ররোচনায় পড়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এমনটিই ঘটেছিল যখন হযরত আদম (আঃ)-কে শয়তান প্রতারিত করেছিল, তখনই তিনি তাঁর কিছু স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছিলেন। কুরআন করীম এই কথা বলে না যে, হযরত আদম ও তাঁর স্ত্রীর দুর্বলতাসমূহ অন্যান্য লোকের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল, বরং তাঁরা নিজেরাই কেবল সেইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়েছিলেন।

৯৫৯। "ওয়ারাক" -এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুর উৎকৃষ্ট ও তাজা অবস্থা; কোন সম্প্রদায়ের কিশোর, তরুণদল (লিসান)। এর মর্মার্থ, যখন শয়তান হযরত আদম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি করাতে কৃতকার্য হলো এবং তার কিছু সংখ্যক সদস্য দল ত্যাগ করে গেল, তিনি জান্নাত (বাগান) -এর "আওরাক" (পত্র বা পাতা)-কে অর্থাৎ তরুণদেরকে সংঘবদ্ধ করলেন এবং তাদের সহায়তায় তাঁর লোকদেরকে পুনঃ একতাবদ্ধ এবং পুনর্গঠিত করতে আরম্ভ করলেন। সাধারণতঃ তরুণ সম্প্রদায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকে। ফলে তারা আল্লাহ্‌তাআলার নবীকে মান্য করে ও সাহায্য করে থাকে (১০ঃ৮৪)। কুরআন মাজীদের বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি আদম (আঃ)-এর অনুগত হতে অস্বীকার করেছিল তাকে ইব্‌লীস নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে; অথচ যে ব্যক্তি তাঁকে প্রলুব্ধ করেছিল তাকে 'শয়তান' বলা হয়েছে। এই পার্থক্য কেবল ব্যাখ্যাধীন আয়াতেই দেখা যায় না, বরং ইহা কুরআনের সংশ্লিষ্ট সকল আয়াতে দেখা যায়। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত বিবরণে উল্লেখিত 'ইব্‌লীস' এবং 'শয়তান' দুই ভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে 'শয়তান' শব্দ কেবল অসৎ আত্মাকেই বুঝায় না, অধিকন্তু ঐ সকল মানুষের জন্যেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে যারা তাদের অসৎকর্ম এবং প্রকৃতির কারণে রক্তমাংসের গঠিত দেহযুক্ত শয়তানরূপে যেন মূর্ত হয়ে উঠে। হযরত আদম (আঃ)-কে যে শয়তান প্রলুব্ধ করেছিল এবং তাঁর পদস্খলনের কারণ ঘটিয়েছিল, সে কোন অদৃশ্য অসৎ আত্মা ছিল না, বরং মানুষের মধ্য থেকেই রক্ত-মাংসের এক কুটিল অসৎ ব্যক্তি ছিল,–এক পাপিষ্ঠ শয়তানের বহির্প্রকাশও ইব্‌লীসের প্রতিনিধি। সে ঐ গোত্রের একজন ছিল, যারা নিকট থেকে দূরে থাকার জন্য আদম (আঃ)-কে আদেশ করা হয়েছিল। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'হারিস' (তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর) এ থেকে আরো প্রতিপন্ন হয় যে, সে জড়দেহী মানুষ ছিল, কোন অশুভ শক্তি ছিল না।

হাদীস শরীফ

রোযার মাহাত্ম্য

১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন রমযান মাস আসে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অপর বর্ণনায় রয়েছে, বেহেশ্‌তের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় আর শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় (মুত্তাফাক আলায়হে)।

২। হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বেহেশ্‌তে আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়্যান'। রোযাদারগণ ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না (মুত্তাফাক আলায়হে)।

৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানব সন্তানের পুণ্যকর্ম বাড়ান হয়ে থাকে; প্রত্যেক পুণ্যকর্ম দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ্ বলেন, রোযা ব্যতীত। কেননা, রোযা আমারই জন্যে এবং আমিই এর প্রতিফল দান করব (যত ইচ্ছা তত)। সে আমারই জন্যে আপন প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানীয়ের জিনিস ত্যাগ করে।

রোযাদারদের জন্যে দু'টি (প্রধান) আনন্দ রয়েছে ঃ একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি বেহেশ্‌তে আপন প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মেশ্‌কের সুগন্ধ অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধিকর। রোযা হচ্ছে মানুষের জন্যে (দোযখের আগুন হতে রক্ষার) ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারও নিকট রোযার দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার (মুত্তাফাক আলায়হে)।

৪। হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঃ রসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রোযা এবং কুরআন (কেয়ামতে) আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনে তার খাবার ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছি সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন (বায়হাকী)।

৫। হযরত আনাস বিন্‌ মালিক (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাস আসলো। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন, এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে, এতে এমন একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে সে সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে বঞ্চিত হয়েছে, আর উহা হতে চিরবঞ্চিত ব্যক্তি ব্যতীত কেউই বঞ্চিত হয় না (ইবনে মাজা)।

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

নামায প্রতিষ্ঠা

অতঃপর মুত্তাকীগণের মর্যাদা সম্পর্কে এসেছে ঃ "ওয়াকিমুনাস্‌ সালাতা" অর্থাৎ সে নামাযকে দাঁড় করায়। এখানে দাঁড় করানো শব্দ এসেছে। এটাও ঐ আনুষ্ঠানিকতারই প্রতি ইঙ্গিত করছে - যা মুত্তাকীগণের রীতি। অর্থাৎ নামায শুরু করার পর তাকে বিভিন্ন রকমের কুমন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয় যার ফলে তার নামায যেন বার বার নীচে পড়ে যায় এবং যা তাকে দাঁড় করাতে হয়। 'নামাযে আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করার পর এক রাশ কুমন্ত্রণা তার একনিষ্ঠ চিত্তে বিচ্ছিন্নতা ঢেলে দিতে থাকে। যার ফলে সে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌছে। সে অস্থির হয়ে যায়। সান্নিধ্য ও প্রশান্তি লাভের জন্য মরিয়া হয়ে সে সর্বক্ষণ সংগ্রাম করে। কিন্তু যে নামায তার পড়ে গেছে, প্রাণপণে তা দাঁড় করানোর চিন্তায় থাকে। "আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি" বার বার পাঠ করে নামাযকে কায়েম করার জন্য দোয়া করে। এবং এরূপ সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হতে চায় যদ্বারা তার নামায দাঁড়িয়ে যায়, এই কুমন্ত্রণার মোকাবেলায় মুত্তাকী একটি শিশুর ন্যায়। সে খোদার সমীপে আবেগভরে দোয়ারত থাকে, কান্নাকাটি করে এবং বলে - "আমি মাটিতে মিশে যাচ্ছি।" সুতরাং এটাই সেই সংগ্রাম যা নামাযের মধ্যে মুত্তাকীকে নিজের আত্মার সাথে করতে হয়। এবং এর ফলেই পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে।

কতক লোক এরূপও আছেন যারা নামাযের মধ্য থেকে কুমন্ত্রণাকে সাথে সাথে দূর করে নিতে চায়। অথচ "ওয়াইউকীমুনাস্‌সালাতা" (এবং নামাযকে কায়েম করে) এর উদ্দেশ্য অন্যকিছু। খোদা কি তা জানেন না?

হযরত শেখ আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) বলেছেন, পুণ্য ততক্ষণ থাকবে, যে পর্যন্ত চেষ্টা-কল্পনা রয়েছে। এবং এর অবসান ঘটলে পুণ্যও বেকার হয়ে যায়। অর্থাৎ নামায-রোযা-তখন পর্যন্ত আমল (কর্ম) হিসাবে গণ্য হবে, যে পর্যন্ত সংগ্রাম করে কুমন্ত্রণার মুকাবেলা করতে হয়। কিন্তু যখন তার মধ্যে এক উন্নত অবস্থার সৃষ্টি হয়-নামায রোযা ও খোদাতাআলার অনুষ্ঠানিকতার চেষ্টা-সাধনা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি সাধুতায় রঙ্গীন হয়ে যান। নামায-রোযা তখন আর আমল (আনুষ্ঠানিকতা) থাকলো না। তারা তখন প্রশ্ন করলো তাহলে কি এখন নামায মাফ হয়ে যায়, কেননা পুণ্য তো ঐ সময় পর্যন্ত ছিলো যতক্ষণ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে। সুতরাং কথা হলো নামায এখন আমল (কর্ম) থাকলো না বরং তা হলো একটি পুরস্কার। এই নামায হলো তার এক পুষ্টিকর খাদ্য যা তার জন্য 'চোখের শান্তি'। এটা হলো যেন নগদ বেহেশ্‌ত।

অপরপক্ষে যারা সংগ্রামরত, তারা কুস্তি করছে এবং মুক্তি পেয়ে গেছে। এর মানে হলো-মানুষের আধ্যাত্মিক পথ-যাত্রা শেষ হ'লে পরে তার বিপদাবলীরও সমাপ্তি ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ একজন খোজা (নপুংসক) যদি বলে যে- সে কখনো চোখ তুলে মেয়েদেরকে দেখে না তাহলে সে কি ধরনের পুরস্কার বা পুণ্য লাভের যোগ্য হবে, তার মধ্যেতো কু-দৃষ্টির কোন উপাদানই নেই? কিন্তু একজন যৌনশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এরূপ করে তাহলে সে সওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে মানুষকে হাজারো রকম পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তার এ প্রচেষ্টা তাকে শক্তিশালী করে তোলে- আত্মার সাথে তার মীমাংসা হয়ে গেছে। এখন তিনি এক বেহেশ্‌তে অবস্থান করছেন, কিন্তু এখানে আগের ধরনের পুণ্য থাকবে না। তিনি একটি ব্যবসা করে ফেলেছেন যার লভ্যাংশ এখন ভোগ করছেন, কিন্তু এটার প্রকার হবে ভিন্ন। কোন কাজ বার বার করার ফলে তা মানুষের স্বভাবগত হয়ে যায়। প্রকৃতিগতভাবে কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের স্বাদ পেয়ে গেলে কোন মতেই তাকে একাজ থেকে ফেরানো যাবে না। স্বভাবগত ভাবেই সে এথেক সরে যেতে পারে না। সুতরাং ভয় ও খোদা-ভীতির চূড়ান্ত সীমা প্রকাশিত হয় না, বরং তা এক প্রকার দাবী-স্বরূপ।

আল্লাহ্‌র দেয়া রিযক (জীবিকা) থেকে ব্যয়

এরপর মুত্তাকীগণের সম্বন্ধে এসেছে "তা থেকে যা আমরা তাদেরকে দিয়েছি, খরচ করে।" মুত্তাকীর জন্য এখানে "মিম্মা" অর্থাৎ (তা থেকে যা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সে তখন এক অন্ধের অবস্থায় থাকে। কেননা খোদা তাকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে কিছু

অবশিষ্টাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

জুমআর খুতবা

রমযানের শেষ দশক ও দোয়ার মাহাত্ম্য

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৮ জানুয়ারী, ১৯৯৯ ইং মাসজিদুল-ফযল-এ প্রদত্ত]

'যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের রূহ্ সিজদাবনত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়া কবুল হবে না।' 'নিজেদের গৃহের জীবনের জন্য সদাসর্বদা দোয়া করুন যাতে গৃহে আল্লাহ্‌র এই যিক্‌রের দরুন গৃহ (-এর সবাই) জীবিত হয়ে ওঠে।'

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয. ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারাহ্‌র ১৮৭তম আয়াত তিলাওয়াত করেন।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

অতঃপর হুযূর বলেন, আজ রাত থেকে রমাযান-মুবারকের আখেরী আশারাহ্ আরম্ভ হচ্ছে। এ দশকটিতে ই'তেকাফকারীগণ ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁরই ভালবাসায় (আত্মমগ্ন হয়ে) ই'তেকাফ বসেন এবং বিশেষভাবে দোয়া করে থাকেন। তবে সর্বাগ্রে আমি সমগ্র জামাতের পক্ষ থেকে দুনিয়া জুড়ে ই'তেকাফকারী আহ্‌মদীদের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি যে, আমরা ভাইয়েরা যারা ই'তেকাফের বাইরে থাকছি কিন্তু আত্মিক সূত্রে তাতে শামিল রয়েছি তাদেরকেও নিজেদের দোয়ায় যেন স্মরণ রাখেন এবং জামাতের সাধারণ সমস্যাবলীকে সম্মুখে রেখে দোয়া করেন। খোদা করুন, যেন এই ই'তেকাফের রাতগুলো কেবল তাদের তকদীরকেই জাগাবার কারণ না হয় বরং জামাতের তথা সমগ্র বিশ্বের ঈপ্সিত নিয়তিকে জাগাবার কারণ হয়ে যায়।

এই ভূমিকার পর আমি ই'তেকাফ সম্পর্কিত কিছু বিষয়ও বর্ণনা করবো, যা প্রত্যেক জায়গায় মু'তাকিফদের দৃষ্টি-পটে থাকা উচিত। এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণই আঁ হযরত (সঃ)-এর উপদেশাবলীর উদ্ধৃতিমূলেই বর্ণনা করবো। অতএব, এ-গুলোর ওপরে বাহ্যিকভাবেও এবং রূহ্ ও অন্তর্নিহিত মর্মের দিক দিয়েও পুরোপুরি আমল হওয়া উচিত।

এখন, এই আসছে দিনগুলো খাস কবুলিয়তের দিন, বিশেষভাবে দোয়া করার দিন এবং রমাযান-মুবারকের মে'রাজস্বরূপ এ শেষ দশকটি। এর মাঝেই একদিন 'লাইলাতুল-কদর'-এর রাত্রিও হবে। এ আশারাহ্‌র প্রত্যেক রাতে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষভাবে ঝোঁকার এবং তাদের দোয়া কবুল করার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং যে-আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি এতে বিশেষতঃ সে বিষয়-বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দোয়ার ওপর সামগ্রিক আলোকপাত সম্বলিত এতোই মহান এ আয়াতটি যে, তা লক্ষ্য ক'রে মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি বিস্ময়াবাক হয়ে পড়ে। দোয়া এবং ঐশী নৈকট্যের কোনও দিক তাতে বাদ পড়ে নি। এর প্রত্যেকটি দিকে এরূপ আলোকপাত এতে বিদ্যমান যে, মানুষ যদি তাতে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে এরপর দুনিয়ার কোন নাস্তিকের সামনে নত হবার কোনও অবকাশ আর থাকে না। এ বিষয়ে আয়াতটিতে এতই অকাট্য ও চিরস্থায়ী যুক্তি-প্রমাণ নিহিত রয়েছে যে, সার্বিকভাবে এই সব বিষয় একই খুতবায় বর্ণনা করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে এ আয়াতের তফসীর-ব্যাখ্যায় উপস্থিত আমি কতক বিষয় বিশদভাবে তুলে ধরবো এবং এরই বিষয়-বস্তুকে ঘিরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু উদ্ধৃতির মধ্যে কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। যদি সময় না বাঁচে তাহলে আগামী খুতবায়ও এ বিষয়টিই অব্যাহত থাকবে। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে "ইযা সায়ালাকা ইবাদী আন্নী ফাইন্নী ক্বরীব"-মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, যখন তোমার কাছে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে "ফাইন্নী ক্বরীব" তখন (বল) নিশ্চয় আমি (তোমাদের) নিকটে রয়েছি। 'ক্বরীব' (নিকট)-এর বহুবিধ অর্থ বর্ণিত হয়েছে কিন্তু একটি অর্থ যা আমি মনে করি সম্পূর্ণ সঠিক সত্য এবং আয়াতের পূর্বাপর বিষয়ের সাথে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ-এতে এতটুকুও কোন রায়ের আমলদখল নেই, বরং এ আয়াত ওমুনটি-ই বলছে। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নৈকট্য বুঝায়। তাঁর নৈকট্যের দরুন খোদা নিকটে। অতএব, যে-বান্দারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে খোদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তারা কি আঁ হযরত (সঃ)-কে অবলোকন করছেনা যে, তাঁর মাঝে খোদা কথা বলেন! সুতরাং এ দিক দিয়ে এ একটি মহান আয়াত-তারা তোমার নিকট প্রশ্ন করে যে, খোদা কোথায়? তাদের দেখিয়ে দাও, তুমি সেই ব্যক্তি যার মধ্যে খোদা বিদ্যমান, তোমার মাঝে খোদা সবাক। আর এর প্রমাণ আয়াতটির পরবর্তী অংশে পেশ করা হচ্ছে।

"উজীবু দা'ওয়াতাদ্ দায়ি ইযা দাআনি"-প্রথম প্রমাণ হলো এই যে, তোমার দোয়া গৃহীত হয় নি এমন কি কখনও হয়েছে? আল্লাহ্ রদ্ করেছেন এমন কোন দোয়া আছে কি তোমার ? অতএব, তুমি (সঃ) প্রমাণস্বরূপ খোদাতাআলার অস্তিত্বের এবং এ বিষয়ের যে, যে-দোয়া তুমি কর এবং যে ধারায় তুমি দোয়া করে থাক ঐ দোয়া-সমূহ

অবধারিতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই 'উজীবু দা'ওয়াতদদায়ি ইযা দায়ানি'-এ আয়াত থেকে যে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, যেন -তেন প্রত্যেকের দোয়া বুঝায় এবং যেন-তেন বলতে পারে সে অনেক দোয়া করা সত্ত্বেও তার দোয়া তো কবুল হয় নি -এখানে এর প্রকৃষ্ট অপনোদন রয়েছে। কেননা, 'দায়ী' (প্রার্থনাকারী) বলতে এখানে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বুঝায়। আর আমার মতে এর প্রথম ও প্রধান অর্থ এটাই। অর্থাৎ 'এই প্রার্থনাকারী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র দোয়া আমি শ্রবণ করি যখন সে আমাকে ডাকে, আমি তার পাশে থাকি।' এরপর সন্দেহের আর কী অবকাশ থেকে যায়? বস্তুতঃ সমস্ত দুনিয়ার জন্যে খোদাতাআলার অস্তিত্বের ইহা এক একাট্য- অখন্ডনীয় প্রমাণ।

আঁ হযরত (সঃ)-এর তো কিয়ামত অবধি সর্বকালের জন্যে সকল দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন এবং তাঁর ঐ সকল দোয়ারই ফল যে, আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহক্রমে ইসলাম দৈনন্দিন নিত্য নূতন সফলতা লাভে সৌভাগ্যমন্ডিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক যুগেই আঁ হযরত (সঃ)-এর দোয়াসমূহ এর সাক্ষী যে, আল্লাহ্ বিদ্যমান এবং তিনি সবার চেয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র খোদা। অতএব খোদাকে যে দেখতে চায় সে কাছে থেকে দেখে নিক, মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাঝে তার জন্যে খোদা পরিদৃষ্ট হবেন। একথাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর সত্তায় আমরা আল্লাহ্কে আলোকসম্পাতরত (অবস্থায়) দেখতে পাই। তাঁর আলোকসম্পাতের জন্যে অন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই। স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সত্তা প্রমাণ করছে যে, খোদাতাআলা তাঁর (সঃ) সত্তায় জ্যোতির্বিকাশ করছেন। অতএব, 'উজীবু দাওয়াতাদ দায়ি ইযা দায়ানী'-মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ যখনই আমাকে ডাকেন তখন তাকে কখনও নিরাশ করি নি আমি।

"ফাল্ ইয়াস্তাজীবূলী"-মানুষের জন্যে আদেশ এই যে, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় যেভাবে সাড়া দিয়েছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। তবে তাদের সাথেও তদ্রূপ ব্যবহারই করবো। "ওয়াল ইউ'মিনূবী"-এর প্রকৃত মর্ম অত্র পূর্বাপর সূত্রে এই দাঁড়ায় যে, তারা যেন তদ্রূপ ঈমান আনে যেরূপ ঈমান এনেছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। কেবল দূরে বসে ঈমানের দাবী উচ্চারণ করা তো সম্পূর্ণই বৃথা। প্রকৃত ঈমান হচ্ছে যা ইস্তেজাবত (-আল্লাহ্র সমস্ত ডাকে সাড়া দান)-এর পরবর্তী ঈমান হয়ে থাকে। আল্লাহ্র সব কথা গ্রহণ কর, তারপরেই ঈমানের কথা বলো। আল্লাহ্র আদেশ গ্রহণ ও পালন ব্যতিরেকে কী করে ঈমানের কথা বলতে পার? আর যে আল্লাহ্র কথা গ্রহণ করে না, সে আল্লাহ্র নিকটেও নয়। আর যে আল্লাহ্র থেকে দূরে থাকে, আল্লাহ কী করে তার নিকটে হতে পারেন ?

অতএব, আয়াতটিতে এক অদ্ভূত ও বিস্ময়কর বাক-ভঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নৈকট্যের দোয়াতো আমি অবিশ্যি শ্রবণ করে থাকি তবে তোমরাও তো আমার নিকটে থাকো; তোমরা তো দূরে বসে আছো-নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছো; অতএব, আমিও দূরে আছি। বস্তুতঃ আল্লাহ্র গুণাবলীর এই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একই সময়ে সবচে' নিকটে, আবার সবচে' দূরে। এতো দূরে যে, কল্পনাও তার নাগাল পায় না। কাজেই তোমরা দোয়া কবুলের কথা তো বল কিন্তু নিজেরা দূরে সরে থাক। অর্থাৎ প্রকারান্তরে আল্লাহ্ (এ আয়াতটিতে) বলছেন, আমার কথায় যখন তোমরা সাড়া দাওনা তখন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তোমরা অনেক দূরে সরে বসে আছ, বধির হয়ে গিয়েছ-বুঝতে পারছ না আমি তোমাদের কী বলছি আর (এমতাবস্থায়) যখন তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর তখন মনে কর আমি যেন তোমাদের নিকটে এসে পড়ি। তা হতে পারে না। ঐ সুন্নতই অনুসরণীয় যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আচরিত সুন্নত। আল্লাহ্তাআলা একমুহূর্তও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যান নি। [কেননা তিনি (সঃ) সবসময় আল্লাহ্র প্রত্যেক কথায় সাড়া দেওয়ায় নিজে তাঁর কাছে থেকেছেন]। আর একারণেই প্রতি মুহূর্তই আল্লাহ্ তাঁর দোয়া শুনতেন।

"লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন"-যদি তোমরা 'হেদায়াত' (সঠিক পথ ও সফলতা) লাভ করতে চাও তাহলে তার জন্যে এটাই নির্ধারিত পন্থা। এখন রমাযানের যে বিশেষ এই রাতগুলো আস্ছে এগুলোতে উক্ত পন্থায় পরিচালিত হতে হবে। যদি তদ্রূপ কর, আল্লাহ্ নির্দেশিত ঐ পন্থায় সাধনা কর, তাহলে "লাআল্লাহুম ইয়ার শুদূন" "-আল্লাহ্র এই ওয়াদা অনুযায়ী তাঁরই অনুগ্রহক্রমে তোমরা সবাই হেদায়াত লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হবে।

এই হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য কীভাবে ঘটবে? এই ঐশী ওয়াদা কীভাবে পূর্ণ হবে? এ প্রসঙ্গে কিছু কথা এখনই আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। তবে পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী সর্বাগ্রে আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর আখেরী আশারাহ্ সম্পর্কিত কিছু হাদীস পেশ করছি যার মাঝে এসব বিষয়ের উত্তর এসে যায়-'লাআল্লাহুম ইয়ার শুদূন'-দ্বারা কী কী বিষয় বুঝায়? কী রূপে তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পার? এই দশ রাত্রের দ্বারা কীভাবে উপকার লাভ করতে পার? এতদ্সংক্রান্ত সকল পথ ও পন্থা আঁ হযরত (সঃ)-এর পবিত্র সুন্নত ও উক্তি থেকে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়।

মুসনাদ আহ্মদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হযরত নবী করীম (সঃ) বলেন, "সৎকর্মশীলতার দিক দিয়ে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রমাযানের শেষ দশকের চেয়ে মহৎ ও প্রিয় আর কোন দিন নেই।" অর্থাৎ এই দশকে আল্লাহ্তাআলা অন্যান্যদেরকে মাহাত্ম্য দান করেন। নইলে, কোন দিন বা রাত আল্লাহ্র কাছে কী করে মহান হতে পারে? মহান এ দিক দিয়েই যে, এই দশকে আল্লাহ্র সংস্পর্শে যারা আসে তাদেরকে ইহা মহানে পরিণত করে। মহান আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক যতো নিবিড় হবে যতো বৃদ্ধি পাবে, বান্দাও ততো মহানে পরিণত হতে থাকবে। এতদুদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এই দশকে বহুল মাত্রায় 'তাহলীল', 'তাকবীর' ও 'তাহ্মীদ' করতে উপদেশ দান করেন। তাহ্লীল মানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ্র তওহীদের স্বীকৃতি সম্বলিত যিক্র, তকবীর মানে 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহ্র সর্বব্যাপী মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি সম্বলিত যিক্র এবং তাহ্মীদ মানে 'আলহাম্দুলিল্লাহ্' আল্লাহ্র সার্বিক প্রশংসার স্বীকৃতি সম্বলিত যিকর রাত-দিন অধিক মাত্রায় আবৃত্তি করতে উপদেশ দান করেন। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' উঠতে বসতে,

শুয়ে জেগে, মুখে- অন্তরে আবৃত্তি করতে থাকা উচিত. হৃদয় যাতে স্পন্দিত হয় এবং মানুষ উপলব্ধি করে যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। এ সত্যটি খাঁটি অন্তরে যখন সে অনুভব করে তখন তকবীর আপনা-আপনি তা থেকে ফুটে ওঠে- 'আল্লাহু আকবার'-আল্লাহ্ই সবচে' বড়। তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং সবচে' বড়- এই দু'টো কথার মাঝে তো আপাতঃ যেন স্ববিরোধও প্রতীয়মান হয়। যখন এক-অদ্বিতীয়, তখন সবচে' বড়-এর অর্থ কী? অর্থ, একমাত্র তিনিই, সমস্ত বড়াই ও মাহাত্ম্য তাঁরই। অবশিষ্ট অন্য সব জিনিস তো কোনও মূল্যই রাখে না। এমনি চোখের বিভ্রমস্বরূপ যা দুনিয়াতে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ্রই শ্রেষ্ঠতার শীর্ষ মর্যাদা সব কিছুতে উদ্ভাসিত হতে পরিলক্ষিত হয়। তবেই কিনা তওহীদের সঠিক সত্যিকার জ্ঞান লাভ হতে পারে। যদি কারও কাছে তদ্রূপ উদ্ভাসিত না হয়, তবে এ সবই চোখের বিভ্রম বৈ আর কিছু নয়। অতএব, 'আকবর' একমাত্র সেই খোদা, সমগ্র বিশ্ব-জগতের যিনি মালিক। তাহ্লীলের দ্বারা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠতা আপনাদের উপর সমুজ্জ্বল হবে। আর যারা সেই তাঁর একনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হন যিনি সবচে' মহান, সেই আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে অবধারিতভাবে তাদেরকে সেই মাহাত্ম্য ও মহানত্ব লাভের সৌভাগ্য দান করা হয়, যা খোদার গোলামদেরকেই দান করা হয়ে থাকে-যে মহানত্ব আঁ হযরত (সঃ)-কে সবচে' বেশী দান করা হয়।

উক্ত দু'টো বিষয়ের দরুন হৃদয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে কৃতজ্ঞতার বহিঃ প্রকাশ ঘটে থাকে। যখন মানুষ খোদাতাআলার তওহীদকে প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বীকার করে এবং এর ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে মহত্ব তার নসীবে ঘটে যা কেবল তাঁর একনিষ্ঠ দাসগণই পেয়ে থাকেন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার বা তাদের অন্তর থেকে 'আল্ হামদুলিল্লাহ্' প্রস্ফুটিত হয়। "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে'-এ বাক্যে দু'টি দিক নিহিত আছে। এক, নিজের সত্তার দিকে যেন বান্দার দৃষ্টি না যায়-এই খেয়াল যেন না হয় যে, আহা! আমিও বড় কিছু হয়ে গেলাম। তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিকার হবে 'আলহাম্দ'-এর দ্বারা-'না, না, প্রশংসারাজী তো কেবল আল্লাহ্রই। আমরা তার কিছু খয়রাতস্বরূপ পেয়েছি; আমাদের তো মূলতঃ কিছুই নয়।' দ্বিতীয়তঃ 'আলহামদুলিল্লাহ' গভীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন-সূচক কলেমায় বা প্রবচনে পরিণত হয়েছে। আঁ হযরত (সঃ)-এর সময় থেকে চলে আসছে যে, যখন ভাল কোন সংবাদ পাওয়া যায় তখন মুখ থেকে অবলীলায় 'আলহাম্দুলিল্লাহ' নিঃসৃত হয়। কাজেই, উল্লেখিত উভয় অর্থে 'আলহাম্দুলিল্লাহ্'র বিরদ (আবৃত্তি) এ দিনগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

আরেকটি হাদীস 'সহী মুসলিম, কিতাবুল ই'তিফাক' থেকে গৃহীত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) রমাযানের শেষ দশকে অত্যধিক মুজাহাদা (সাধনা) করতেন, এতো যে ঐ দিনগুলো ব্যতীত অন্যান্য দিনে ততো মুজাহাদা করতেন না। অতএব, এর প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী আহ্মদীদের উদ্দেশ্যে আমার নসিহত হলো, গাফিলতি যদি আগে হয়ে থাকে তা পরিহার করুন এবং এখন এই দশকের মুজাহাদায় আত্মনিয়োগের জন্যে নিজেরা তৈরী হয়ে নিন।

মসলিম, কিতাবুয যিক্র-এ আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি রয়েছে যে, (একদল সাহাবাসহ) আঁ হযরত (সঃ) কোন এক সফরে ছিলেন তখন মানুষ জোরে জোরে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকলেন। তাতে হুযূর পাক (সঃ) বললেন, হে জনগণ! মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর. তোমরা তো কোন বধিরকে আহ্বান করছো না এবং এমন কাউকেও না যিনি নিকটে উপস্থিত নন। তোমরা বস্তুতঃ আহ্বান করছো তাঁকে, যিনি 'সামী' (সর্বশ্রোতা) এবং তাঁকে, যিনি হচ্ছেন 'ক্বরীব' (নিকটে উপস্থিত)।" এখন এই উপদেশটি থেকে আমরা ঐশী নৈকট্যের অর্থও জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-এর পাশাপাশি, তাঁর সাহাবাদেরও নিকটে ছিলেন। অনেক বড় ধরনের সুসংবাদ এটা সাহাবাদের জন্যে। তারা তাকে ডাকছেন যিনি হচ্ছেন তাদের নিকটে। মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ও ছিলেন নিকটে, যাঁর মাঝে আল্লাহ্ ছিলেন বিরাজিত। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র মাধ্যমে, তাঁর কল্যাণ প্রসাদে সাহাবাগণও ছিলেন খোদার নিকটে এবং তাদের মধ্যেও খোদা আলোকসম্পাত করেছিলেন। অতএব, আল্লাহ্ যেহেতু সর্বশ্রোতা এবং ক্বরীব (নিকটে উপস্থিত), সেহেতু অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে ডাকো। উঁচু আওয়াজে তাঁকে ডাকা জরুরী নয়। কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন কিন্তু খোদাকে শোনাবার জন্যে নয়, বরং এরূপ মানুষদের শোনাবার জন্যে, যাদের ওপর তকবীরের প্রতাপ ও প্রভাব আরোপ করা আবশ্যকীয় ছিল। অতএব, ওরূপ ক্ষেত্রে তকবীর ধ্বনি সজোরে উচ্চারিত হয় তাদেরকে শোনাবার উদ্দেশ্যে যারা হয়ে থাকে আল্লাহ্র যিক্রের প্রতি বধির-স্বরূপ, যাতে তকবীরের ছোঁয়া তাদের হৃদয়ে লাগলে তাদের সুপ্ত হৃদয় জেগে ওঠে। হয়ত এর কষাঘাতে আল্লাহ্তাআলার যিক্র তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

'বুখারী, কিতাবুস সওম', হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, যখন রমাযান শেষ দশকে প্রবেশ করতো বা শেষ দশক শুরু হতো, তখন আঁ হযরত (সঃ) কোমর বেঁধে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন, তাঁর রাতগুলোকে জীবিত করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকেও ইবাদতের জন্যে জাগাতেন।" পরিবার-পরিজনকে জাগানো তো তাঁর সব সময়ের সাধারণ রীতি ছিল এবং তাঁর রাত্রিগুলোও (ইবাদতে) জীবিত-ই থাকতো। এই হাদীস থেকে অধিকতর চেষ্টা-প্রয়াস এবং অধিকতর মনোনিবেশ প্রমাণিত হয়। অতএব, যাঁরা আগে থেকে তাহাজ্জুদগুযার রয়েছেন তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই দশ রাতের তাহাজ্জুদের মধ্যে নূতন কোন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত, যা তাদের পূর্বের আদায়কৃত তাহাজ্জুদে ছিলনা। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামাযে তো যাবতীয় সবরকম বৈশিষ্ট্যই ছিল তা সত্ত্বেও তিনি (সঃ) ঐ রাতগুলোতে বিশেষ সাধনা করতেন এবং এ কারণে খোদাতাআলার এই ওয়াদা যে, 'ইন্নি ক্বরীব' তা হচ্ছে নিকটে হওয়া সত্ত্বেও আরও নিকটে হবার ওয়াদা। এর কী অর্থ? এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র নৈকট্য অনন্ত-অসীম। এই ধারণা মন থেকে বের করে দেয়া উচিত যে, 'আমরা আল্লাহ্র নিকটে হয়ে গিয়েছি, এ-ই যথেষ্ট হয়েছে।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও আল্লাহ্র এরূপ নিকট হননি যে, এর পরে আরও নিকটে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। সেরূপ

যদি হতো, তাহলে আঁ হযরত (সঃ)-ও স্থবির এবং খোদাও স্থবির হয়ে যেতেন। অথচ যে খোদা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ওপর আলোক-সম্পাত করেছেন সে-খোদা কখনও স্থবির নন, একই জায়গায় তিনি থেমে নন। নৈকট্যেও তিনি অগ্রসর হয়ে থাকেন। আর মানুষ যখন ভাবে যে, এর চে' বেশী নৈকট্য কি সম্ভব নয় তখন সে আরও নৈকট্যের দৃশ্য অবলোকন করে থাকে। বস্তুতঃ আঁ হযরত (সঃ) এহেন নৈকট্যে সদা অগ্রসরমান থাকেন। কেউ বলতে পারেনা যে, নৈকট্যে কোনও মার্গে পৌঁছার পর তিনি সেখানে থেমে গিয়েছিলেন। অতএব, সেজন্যেই আল্লাহ্তাআলা আঁ হযরত (সঃ)-কে অধিকতর নৈকট্যের ওয়াদা দিতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট অন্যান্য যতো তাহাজ্জুদগুযার ও খোদার পথের সন্ধানী যারা রয়েছেন তাদের জন্যে এ বিষয়টিতে বড় ধরনের উপদেশ নিহিত রয়েছে, তারা যেন ঐশী নৈকট্য সন্ধানে আরও সচেষ্ট হন।

কোনও এক পর্যায়ের নৈকট্যের কথা ভেবে সেখানে থেমে যাওয়া যথেষ্ট নয়। এটা পার্থিব প্রেমিকদের কাজ যে, তারা পরস্পর ঘনিষ্ট হতে হতে কোন এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়। আর যেখানে থেমে যায় সেখান থেকেই তাদের প্রেম মরতে শুরু করে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র প্রেম চিরস্থায়ী এবং তাঁর নৈকট্যের পথে এমন কোন মার্গ নেই যেখানে আপনারা থেমে যাবেন আর তখনই প্রেম মৃয়মাণ হতে শুরু করবে। সুতরাং, এই সব বিষয়-বস্তু আঁ হযরত (সঃ)-এর এ সুন্নতটির অন্তর্ভুক্ত যে, (আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পথে) তিনি তাঁর কোমর বেঁধে আত্ম-নিয়োজিত হতেন। যেমন কেউ পরিশ্রমের কাজের জন্যে তার কোমর-বন্ধন কষে বেঁধে নেয়। এটাকেই আরবী ভাষার বাগ্ধারায় কোমর বেঁধে নেওয়া বলা হয়। অতএব, আঁ হযরত (সঃ)-ও ওরূপেই কোমর কষে বেঁধে নিতেন (আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সদা অধিকতর অগ্রসরমান হবার উদ্দেশ্যে)।

তাঁর ই'তেকাফে বসার যদ্দুর সম্পর্ক সে-প্রসঙ্গে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসটি আমাদের পথপ্রদর্শন করছে। মুসনাদ আহ্মদ বিন হাম্বল থেকে গৃহীত, রমাযানের শেষ দশকে তিনি (সঃ) ই'তেকাফ করেন। তাঁর জন্যে খেজুরের শুকনো ডাল-পাতা দিয়ে হুজরা (কক্ষ) নির্মাণ করা হয়। স্মরণ রাখবেন যে, ঐ যুগে মসজিদ-নববী আয়োতনের দিক দিয়ে এতো বড় বিস্তৃত ছিল যে, বর্তমান কালের মসজিদগুলোতে আপনারা তা ভাবতেও পারেন না। অনেক বিশাল-ব্যাপক মসজিদ-নব্বী। সেখানে জায়গায় জায়গায় পৃথক পৃথক তাবু স্থাপন করা হতো। আলাদা আলাদা হুজরা তৈরী করা হতো এবং সাধারণতঃ একজনের আওয়াজ আরেকজনের নির্জনতায় ব্যাঘাৎ ঘটাবার কারণ হতো না। এ-ই চলমান রীতি ছিল।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (সঃ) কক্ষের বাইরে উঁকি দিয়ে বললেন, এখন সকল ই'তেকাফকারী মনোযোগ দিয়ে শুনে নিন। তিনি কী বললেন, নামাযী তার প্রতিপালক প্রভুর কাছে আকুতি-মিনতি ও প্রেমনিবেদনে আত্মমগ্ন হয়ে থাকে সেজন্যে জরুরী, একে অন্যকে শোনাবার উদ্দেশ্যে 'কিরয়াত বিল জাহ্র' (উঁচু কণ্ঠে তিলাওয়াত) করো না। হাদীসটির ভাষ্য হচ্ছে "লা ইয়াহ্জার বা'যুকুম আলা বা'যিন বিল কিরয়াতে" অর্থাৎ এর দু'টো অর্থ করা যেতে পারে- 'নিজের কিরায়াতের দ্বারা আরেকজনের কিরয়াতে যেন ব্যাঘাৎ না ঘটায়'। আরেকটি প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্যে'। তবে সাধারণতঃ ই'তেকাফ বসার যে রীতি রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কখনও শুনি নি যে, কেউ তার কোন হুজরায় বসে অন্য কাউকে শোনাবার জন্যে কুরআন পাঠ করে। এ তো কোন কুরআন-ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কিন্তু অপর দিকটি-ই সঠিক যে, যদি কেউ উঁচু আওয়াজে তিলাওয়াত করে তাহলে সে অন্যের তিলওয়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে। আর এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র সঙ্গে একাগ্রচিত্তে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার রাত। তাতে কারো এই অধিকার নেই যে, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাই হোক না কেন নিবিড় চিত্ততার এই নির্জন মুহূর্তগুলোতে কোনও ব্যাঘাৎ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এখন, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) যে তাঁর তাঁবু থেকে বের হয়ে এ কথাটি বললেন তাতে দু'টি বিষয় সুনিশ্চিৎ। এক, আঁ হযরত (সঃ)-এর কিরয়াতের আওয়াজ অন্যান্য তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছুতো না। যদি পৌঁছতো তাহলে ঐ নসীহত তিনি করতেই পারতেন না। কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর চেয়ে বেশী ভালবাসা আর কার-ই বা হতে পারে? তাঁর তিলাওাতের আওয়াজ তো তাঁবুর আওতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে আর অন্য কোনও তাঁবুর আওতায় ব্যাঘাৎ সৃষ্টি করে না কিন্তু অন্যদের আওয়াজ এসে ব্যাঘাৎ সৃষ্টি করে-তা তখনই সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর তাঁবু পর্যন্তও আওয়াজ এসে পৌঁছুতো। সুতরাং তিনি তা শ্রবণ করেন এবং অপসন্দ করেন এবং অন্যান্যদের জন্যেও এইসূত্রে এক রকম নিরাপত্তার বিধান করেন যে, **প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার রয়েছে, আল্লাহতাআলার সঙ্গে নির্জন নিবিড় চিত্ততার ব্যাপারে সে যেন পৃথক এবং গোপন থাকে। অন্য কেউ যেন তার ইবাদতে ব্যাঘাৎ সৃষ্টির কারণ না হয়। উল্লেখিত বিষয়টি যেন আমাদের মু'তাফেকীন দৃষ্টি-পটে রাখেন।** অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে যে, তাঁরা তাদের ইবাদত করার সময়ে, গিরিয়াযারীর সময়ে অথবা তিলাওয়াত করার সময়ে এসব কথা ভুলে যান আর এর ফলে সব সময় আপত্তির সৃষ্টি হতে থাকে।

এখন, একটি হাদীস 'আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সালাত' থেকে নেয়া হয়েছে। হযরত ফাযালা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, আঁ হযরত (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শ্রবণ করলেন, সে আল্লাহ্তাআলার হাম্দ ও সানা করে নি এবং নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি দুরূদও পাঠায় নি। অতএব, যারা তাদের দোয়াসমূহকে মকবুল (গ্রহণযোগ্য) করে তুলতে চান তাঁরা এই নসীহতটি মনোযোগ সহকারে শুনে নিন যে, রমাযানের দোয়াসমূহ গৃহীততো হবে কিন্তু আগে তস্বীহ, তাহ্মীদ ও দুরূদ পাঠ করা আবশ্যকীয়। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, সে তাড়াহুড়া করেছে অর্থাৎ ত্বরিৎ সে তার ঈপ্সিত কথায় চলে এসেছে এবং ভুলে গেছে যে, যে পথ ধরে তার স্বার্থের কথা বলা উচিত ছিল যার দরুন সে সফলকাম হতে পারতো তা সে অবলম্বন করতে বিস্মৃত হয়েছে। সে Short cut করে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার চেষ্টা করেছে। শর্ট কাট করতে গিয়ে মানুষ কোনসময় আবার পদস্খলিতও হয়ে থাকে, উদ্দেশ্য হাসিলেই ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা ধারা ও কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তোমরা যদি নিজেদের দোয়াকে কবুল করাতে চাও তাহলে এই পদ্ধতি অবলম্বন কর। সে পদ্ধতিটি কী ? তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা সে ব্যতীত অন্য কাউকে বললেন তবে সে-ও শ্রবণ করছিল, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দোয়া চায় তখন সে যেন তার প্রভু আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও সানা করে। এতদ্ব্যতীত কখনও যেন সে দোয়া না চায়। তারপর নবী করীম (সঃ)-এর ওপর যেন দুরূদ পাঠায়।" হাদীসটির ভাষ্য হচ্ছে– "সুম্মা ইউসাল্লি আলান নবীয়ে" আর সেই সঙ্গে "সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম"-ও বলেন। এখানে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে পৃথক করে আমাদের উদ্দেশ্যে "সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম" শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেন। আসল রিওয়ায়াতে হুবহু ওরূপেই লিপিবদ্ধ আছে। তারপর বলেন, "সুম্মা ইয়াদ্‌উ বা'দু মা শা'য়া"– এর পরে যা ইচ্ছা দোয়া করুক। "যো দোয়া কীজিয়ে কবুল হ্যয় আজ" ধরনের ব্যাপার হবে। তখন যে দোয়াই করা হোক তা গ্রহণযোগ্য দোয়া হবে।

আঁ হযরত (সঃ) দোয়ার কবুলিয়ত সম্পর্কিত বিশেষ একটি মওকার কথা উল্লেখ করেছেন যখন দোয়া বেশী কবুল হয়ে থাকে। সে মওকাটি কী? তা হচ্ছে সিজদার অবস্থা। 'মুসলিম কিতাবুস্ সালাতে' হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, মানুষ তার প্রতিপালক প্রভুর সবচে' নিকটে হয় তখন, যখন সে সিজদায় থাকে সেজন্যে তখন অনেক দোয়া করো (মুসলিম কিতাবুস সালাত বাবু মা ইয়াকূলু ফির্‌রুকূয়ে ওয়াস্ সজূদ)।

এখন, এ হাদীসটির অন্যান্য কোন কোন হাদীসের সাথে আপাতঃ দৃষ্টে এক বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। হযরত আয়েশা ও অন্যান্য উম্মহাতুল মু'মিনীন এবং সাহাবাগণ বর্ণিত কতিপয় রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রায় সারা রাত খোদার সমীপে দন্ডায়মান অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন, এমন কি তাঁর পা ফুলে যেতো। এখন, সিজদার অবস্থা এবং কিয়াম বা দন্ডায়মান অবস্থার মাঝে এ প্রসঙ্গে পার্থক্য কী ? তা আমি বোঝাতে চাই যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রকৃতপক্ষে তখনও সিজদার অবস্থাতেই হতেন। আসল সিজদা হচ্ছে রূহের সিজদা। বাহ্যিক সিজদাও ঐশী নৈকট্যের এক প্রতীকি চিহ্নস্বরূপ হয়ে যায়। তাছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সিজদাগুলোও সুদীর্ঘ হবারও উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বেশিরভাগ বর্ণনায় রাত্রিকালে সুদীর্ঘ কিয়ামের উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যায়। অতএব, এই ধারণা গ্রহণ করা যে, সিজদা একটি পৃথক অবস্থা ছিল এবং কিয়াম ভিন্ন এক অবস্থা ছিল তা এজন্যে সঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আত্মা বা রূহ্ কখনও সিজদা থেকে পৃথক হয় নি। সুতরাং তাঁর রূহ্ সিজদাবনত থাকতো যদিও কিনা দেহ দন্ডায়মানই হতো। আর তিনি (সঃ) বলছেন, সিজদার অবস্থায় আল্লাহ্ নিকটতর হয়ে থাকেন। অতএব, আল্লাহ্ তাঁর (সঃ) অধিকতর নিকটে ছিলেন। যদিও বা নামাযে তিনি দন্ডায়মান অবস্থায় থাকুন অথবা বাহ্যিকভাবে সিজদারতই হোন। অতএব, এ বিষয়টি স্মরণ রাখবেন যে, **যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের রূহ সিজদাবনত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দোয়াসমূহ কবুল হবে না।** যতোক্ষণ পর্যন্ত আত্মা সিজদাবনত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দৃশ্যাবলী অবলোকন করতে পারবেন না।

দোয়া কবুল হবার আরেকটি পদ্ধতি আঁ হযরত (সঃ) বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে বর্তমান দিনকালের আগেই বর্তমান দিনকালের প্রস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আজ আমরা চাই যেন আমাদের দোয়া কবুল হয়। আর তেমনি বিপদ-মসিবতের সময় আমরা চাই আমাদের দোয়া যেন কবুল হয়। আঁ হুযূর (সঃ) বলেন, "যখন সচ্ছলতার দিন থাকে-যখন তোমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন বা অভাব অনটন থাকে না, তখন আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হও এবং মুনাজাত করো। তাহলে এরূপ কখনও হতে পারে না যে, তোমাদের প্রয়োজনের সময়ে আল্লাহ্ তোমাদের ভুলে যান।" অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এদিনগুলো (রমাযানের শেষ দশক) বিশেষ কবুলিয়তের দিন-স্বরূপ এবং ঐশী নৈকট্যের দিন-স্বরূপ এজন্যে ছিল যে, তাঁর সাধারণ দিনকালও তদ্রূপই ছিল। কখনও তাঁর ওপর এরূপ কোন অবকাশের দিন আসে নি যখন তিনি কিনা আল্লাহ্‌র স্মরণের প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অমনোযোগী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ প্রয়োজন পড়ার আগেই প্রয়োজনগুলোর জন্যে তিনি দোয়া করে থাকতেন। আর এ সুন্নতটি তাঁর এতোই সুমহান যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে কিয়ামতকাল অবধি সম্ভাব্য যা প্রয়োজন আসন্ন ছিল, কল্পনার চোখে সেগুলোর বিবেচনা করেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তজ্জন্যে দোয়া করে নেন।

কাজেই সেই খোদা তাঁর দোয়াসমূহ কী ক'রে অগ্রাহ্য করতে পারেন ? যখন কিনা তিনি সেগুলোর কোনও প্রয়োজন পড়ার বা দেখা দেয়ার আগেই সেগুলোর জন্যে দোয়া শুরু করে রাখেন। অতএব, যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই এই মহান বান্দা তাঁর আল্লাহ্‌কে তাঁর নিকটে পাবেন, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকটে তো তিনি বিদ্যমানই থাকেন। কিন্তু আমরা তাঁকে নিকটে প্রত্যক্ষ করে থাকি। অর্থাৎ বড়ই অদ্ভুত বিস্ময়কর বিষয়বস্তু যে, চৌদ্দশ' বছর পরও আঁ হযরত (সঃ)–এর দোয়া এমন ধারায় কবুল হচ্ছে যে, আমরা খোদাকে নিকটে দেখতে পারছি। কিন্তু নিকটে হয়ে থাকেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। আর ঐ নৈকট্যের দৃশ্যাবলীই আমরা অবলোকন করে থাকি। অতএব, সচ্ছলতা ও আরামের সময়ে আপনারাও এ পদ্ধটিই রপ্ত করুন। ঐ দোয়াগুলো করবেন যা দু'টি দিকসম্পন্ন। একটি এই যে, সচ্ছলতা থাক, আরাম বিরাজ করুক এবং আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন না থাক তবুও যেন আল্লাহর আবশ্যকতা থাকে। এই যে আল্লাহকে আমাদের প্রয়োজনের বিষয়টি তো এই আয়াতে করীমায় অন্তর্নিহিত রয়েছে, যা আমি পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি- "যখন সে আমাকে ডাকে।" প্রয়োজন পূরণের সেখানে উল্লেখ নেই – একথা বলেন নি, 'আমাকে প্রয়োজন পূরণের জন্যে ডাক' বরং বলেছেন, "আমাকে অন্বেষণ করতে থাকুক, আমাকে ডাকতে থাকুক– আমিই যেন তাদের কাম্য হই। যদি তা-ই হয় তাহলে এই সাধারণ দিনগুলোতে যখন কিনা খোদার কাছে চাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না তখনও খোদার অন্বেষণ বিদ্যমান থাকা উচিত। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই সকল বিষয়-বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, **সচ্ছলতা ও আরামের সময়ে যখন**

প্রয়োজনের খাতিরে তোমাদের খোদা স্মরণে না আসেন, তখন খোদার খাতিরে যেন খোদা তোমাদের স্মরণে আসেন। তখনও যদি খোদাকে তোমরা ডাকতে থাক, তাহলে তোমাদের প্রত্যেক বিপদে ও সংকটে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।

অতঃপর হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস যা 'বুখারী, কিতাবুদ দায়াওয়াত বাব ফাযলু যিকরিল্লাহ্'থেকে গৃহীত। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "যে তার প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ করে তাঁর 'যিক্‌র' করে, এবং যে করে না এতদোভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" অতএব, তোমাদের উচিত যেন জীবিত হও এবং তোমাদের জীবন যেন যিকরে ইলাহীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এমনি তো দুনিয়াতে চল ফির, পানাহার কর। যে অস্থায়ী জীবনকাল এখানে নির্ধারিত আছে তা তোমরা পাবে- হয়ত তা সচ্ছলভাবে কেটে যাবে, না হয় দুঃখে-কষ্টে যেমন কিনা তোমাদের ভাগ্যে রয়েছে তারপর মরে যাবে কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ হতে জীবন পায় সে (আসলে) আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিকরের দ্বারাই জীবিত হয়, সে মরে না। এ বিষয়-বস্তুই প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে। নইলে, বলতে পার, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করল সে-ও মরে গেল আর যে করল না সে-ও মারা গেল। যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করেছে সে কখনও মরে না, কেননা, আল্লাহ্ কখনও মারা যান না। কাজেই আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দরুন সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জীবন পেয়ে যায়, যা ইহকালীন জীবনের সাথেও সম্পর্কযুক্ত এবং পরকালীন জীবনের সাথেও।

সহী মুসলিমে উক্ত বিষয়েরই আরেকটি হাদীস নিম্নরূপঃ তিনি (সঃ) বলেন, যে গৃহে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় এবং যে-গৃহে করা হয় না এতদোভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (মুসলিম, কিতাবুস্ সালাত, বাব ইস্তেজাবু সালাতিল্ নাফেলাতে ফি বায়তিহি ওয়া জাওয়াযিহা ফিল মাসজিদে)। এ হাদীসটি আমাদেরকে এ বিষয়ে মনোযোগী ও সচেতন করে তোলে যে, একটি গৃহে বসবাস করে যদি কিছু পরিবার-সদস্য মৃতবৎ হয় যারা যিকরে ইলাহী করে না- তাঁকে স্মরণ করে না, তাহলে যারা যিক্‌রে ইলাহী করে তাদের ফয়েয ও কল্যাণকর প্রভাব ঐ মৃতবৎদের পৌঁছতে ও পড়তে পারে। তাতে ঐ ঘরকে আল্লাহ্ জীবিত করে দিবেন। অতএব, অন্যেরাও যারা সেখানে থাকবে তারাও কিছু কল্যাণ ও ফয়েয পেতে পারে। কাজেই, বিশেষতঃ ঐ সকল লোক **যাদের সন্তানদের মাঝে, যাদের পরিজন ও আত্মীয়দের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র বিমুখ লোক রয়েছে, তাঁরা এ হাদীসটি দৃষ্টিপটে রেখে নিজেদের গৃহের সঞ্জীবনের উদ্দেশ্যে অধিকমাত্রায় দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দ্বারা সারা ঘর জীবিত হয়ে যায়।** কেবল তাঁদের নিজেদের পর্যন্তই তা সীমিত না থাকে।

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস প্রসঙ্গেই আমি সমগ্র জামাতের সমীপে দোয়ার জন্য অনুরোধ করে এসেছি। এদিনগুলোতে বিশেষরূপে দোয়া হওয়া উচিত এবং এই দোয়ার যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তা আঁ হযরত (সঃ)-এর এই সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যা হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, উমরার জন্যে আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমিত প্রদান করলেন আর সেই সাথে বল্‌লেন, "হে আমার ভাই ! আমাদেরকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না।" উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা ছিলেন তিনি, যিনি সমস্ত জাহানের জন্যে দোয়া করতে থাকেন আজীবন, পূর্ববর্তীদের জন্যও এবং পরবর্তীদের জন্যও এবং কিয়ামতকাল অবধি যাঁর দোয়াসমূহ হচ্ছে আমাদের পুঁজি, তাঁর বিনয়ের মোকাম ও মর্যাদা লক্ষ্য করুন, তাঁর অমায়িকতা দেখুন। হযরত উমরকে (রাঃ) বলেন, হে আমার ভাই ! নিজের দোয়াতে আমাদের কথা ভুলে যেও না। হযরত উমর (রাঃ) ঐ মহান বক্তব্যটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতেন। তাই যখন তাঁকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তা বলেন তখন হযরত উমর (রাঃ) বলছেন, 'হুযূরের সে কথায় আমি নিজেকে এতো আনন্দিত বোধ করি যে, এর বিনিময়ে যদি সারা দুনিয়া আমি পেয়ে যাই তবুও ততোটা আনন্দ বোধ করবো না।' তিরমিযী, কিতাবুদ দায়াওয়াত)।

হযরত উমর (রাঃ) রেওয়ায়াত করেন, উমরার জন্যে আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমিত প্রদান করলেন আর সেই সাথে বল্‌লেন, "হে আমার ভাই ! আমাদেরকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না।" উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা ছিলেন তিনি, যিনি সমস্ত জাহানের জন্যে দোয়া করতে থাকেন আজীবন, পূর্ববর্তীদের জন্যও এবং পরবর্তীদের জন্যও এবং কিয়ামতকাল অবধি যাঁর দোয়াসমূহ হচ্ছে আমাদের পুঁজি, তাঁর বিনয়ের মোকাম ও মর্যাদা লক্ষ্য করুন, তাঁর অমায়িকতা দেখুন।

দোয়ার জন্যে বলাতে তিনি এজন্যেই খুশী হয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত উমর (রাঃ)-কে নিজের জন্যে দোয়ার ঐ যে সনদ প্রদান করলেন তা থেকে তিনি দোয়ার কবুলিয়তের সুসংবাদ পেয়ে যান। যদি হযরত উমরের দোয়া কবুল হবার বিষয়ে এবং যে খাঁটি নিয়্যত ও নিষ্ঠার সঙ্গে হযরত উমর (রাঃ) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন সে সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেয়াল না হতো, তাহলে কখনও তিনি (সঃ) উমর (রাঃ)-কে নিজের জন্যে দোয়ার কথা বলতেন না। হযরত উমরের (রাঃ) তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও লক্ষ্য করুন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যেমন আল্লাহ্‌র তত্ত্ব-পরিচিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন তেমনি আল্লাহ্‌র এই মহান বান্দা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা হযরত উমরও (রাঃ) জানতেন। একারণেই তিনি খুশী হন। নইলে প্রত্যেকে বলবে, 'দেখো! আমাকে দোয়ার জন্যে বলেছেন, আমি তাতে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।' সে তার মধ্যে অহমিকার দরুনই খুশী হচ্ছে। পক্ষান্তরে হযরত উমরের মধ্যে কোন অহমিকা ছিল না- রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে দোয়ার জন্য বলাতে স্ফীত হয়ে তিনি খুশী হচ্ছিলেন না। বরং খুশী এজন্যে হচ্ছিলেন যেমন আগেই আমি বর্ণনা করেছি যে, তিনি (রাঃ) জানতেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দোয়ার জন্যে বলায় একটি সুসংবাদ নিহিত ছিল যে, তাঁর (রাঃ) দোয়া কবুল হবে, এর মোকাবেলায় যদি সমস্ত দুনিয়া পেতেন তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করতেন না।

এখন, লাইলাতুল-কদরও হয়ত এদিনগুলোতেই আসবে। আল্লাহ্ ভাল জানেন কে এর সৌভাগ্য পাবে আর কে পাবে না। কিন্তু যারই এ সৌভাগ্য লাভ হয় অথবা অন্ততঃ যার এই ধারণা থাকে যে, এই লাইলাতুল কদর পাবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটবে তার পক্ষে আঁ হযরত (সঃ)-এর ঐ দোয়াটি কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যা কিনা লাইলাতুল-কদরের দোয়াসমূহের প্রাণস্বরূপ। হযরত

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি যদি জ্ঞাত হই যে, তা লাইলাতুল-কদর বটে, তাহলে সে মুহূর্তে আমি কী দোয়া চাইব ? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বল্লেন, তখন এই দোয়া করো; "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউয়্যুন, তুহিব্বুল আফ্ওয়া, ফা'ফু আন্নি" (জামে তিরমিযী, কিতাবুদ দায়াওয়াত)। –হে আমার আল্লাহ্ ! তুমি অত্যন্ত মার্জনাশীল, অত্যন্ত উপেক্ষাকারী, 'তুহিব্বুল আফ্ওয়া" এবং উপেক্ষা করাই তুমি পসন্দ কর, "ফা'ফু আন্নি"–অতএব, আমার ক্ষেত্রে উপেক্ষা কর (এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আমাকে দেখ)। তরজমাকারীগণ তরজমা করেছেন, আমাদেরকে বখশে দাও, ক্ষমা কর। অথচ "আফুয়্যুন"–এর অর্থ এখানে ক্ষমা করা বা বখশে দেয়া নয়। তা এর আগের স্তর। যদি তা পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে তা হলে অবলীলায় সে-ব্যক্তি ক্ষমাই পেয়ে গেল। 'আফুয়্যুন' দ্বারা বুঝায় যে, আমাদের তথা সমস্ত মানুষের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষাকারী এবং তার (প্রিয়) বান্দাদের দুর্বলতাগুলোও তিনি উপেক্ষা ও মার্জনা করে থাকেন। যখন উপেক্ষা করা হয় তখন দুর্বলতা যেন আর থাকেই না–মার্জনা করে দেয়া হয়। অতএব ক্ষমার পূর্ববর্তী স্তর হচ্ছে 'আফ্উ'-এর স্তরটি। যদি আফ্উ-এর সৌভাগ্য লাভ হয় তাহলে ক্ষমা বা 'বখশিশ' যেন এমনিতেই লাভ হল 'আফ্উ'-এর কল্যাণেই।

সুতরাং এখানে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) 'ফাগ্ফিরলি'-এর দোয়া শিখান নি। তা এজন্যই যে, ক্ষমা প্রদর্শন ব্যতিরেকেই 'আফ্উ' মূলতঃ পরিপূর্ণ এবং প্রথম ও প্রধান স্থানবিশিষ্ট, যদি আল্লাহ্তাআলা আজীবন স্বীয় বান্দাদের সাথে 'আফ্উ' সুলভ ব্যবহার করেন এবং তার পাপসমূহ উপেক্ষা করতে থাকেন তাহলে এর ফলাফল কী হতে পারে ? দু'টি ফল হতে পারে। একটি ভাল, আরেকটি মন্দ। ভাল ফলটি তো এই যে, 'আফ্উ'-এর ফলশ্রুতিতে মানুষের অন্তরে তাঁর সম্বন্ধে মাহাত্ম্যবোধ এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রতিনিয়তঃ সে চেষ্টা করে যেন এমন মওকা না আসে যখন তিনি আমার গোনাহ্র কারণে আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আরম্ভ করেন-মন্দ চোখে আমাকে দেখেন। এ সেই ফল, যার দিকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের মনোযোগী করছেন এবং লাইলাতুল-কদরের দোয়ার ক্ষেত্রে এরচে' উত্তম ও অধিকতর দোয়া আর কী হতে পারে ? অপর ফলটি হতে পারে পাপের আস্পর্ধা। আপনারা বাড়ীতে জানেন শিশুসন্তানদেরকে তাদের ভুল-ভ্রান্তির জন্য কখনও যদি শাসন না করেন, সবসময় যদি উপেক্ষা করতে থাকেন তাহলে মন্দ কাজে তাদের আস্পর্ধা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কাজেই, আঁ হযরত (সঃ) লাইলাতুল কদরের সময় গোনাহ্র আস্পর্ধার দোয়া তো অবশ্যই শিখাচ্ছিলেন না। সেজন্যই, এ দোয়াটিতে সে অর্থই নিহিত যা আমি বর্ণনা করছি। এ দিক দিয়ে 'আফ্উ' গুফ্রানের উর্ধ্বতন স্থান বটে। অর্থাৎ যখনই খোদা 'আফ্উ' সুলভ ব্যবহার করেন তখন সহসা আপনাদের মানোযোগ সে দিকে নিবদ্ধ হোক। অনেক সময় মানুষ ঠাহর করতে সক্ষম হয় এবং ভুল করার সময় মানুষ বলে যে, আমি ভুল করছি। তখন সহসা খেয়াল হয় যে, আরে! একজন যে খোদা আছেন তিনি আমাকে প্রত্যক্ষ করছেন আর তখন অন্তর থেকে দোয়া নির্গত হয়, তিনি যেন উপেক্ষা করেন। এরপর যখনই ভুল সংঘঠিত হতে যাবে, এই খেয়াল তখন অন্তরে নিশ্চয় জেগে ওঠবে।

তারপর, এ খেয়ালও তো জাগ্রত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্র দৃষ্টি কল্যাণ থেকে আমি কেন-ই বা এক মুহূর্তও পৃথক বা বঞ্চিত থাকি। শুধু কি এজন্য যে, আমি দুর্বল এবং গোনাহ্তে বারবার লিপ্ত হয়ে পড়ি ? এটা এই দোয়ার এক স্বাভাবিক ফল- একটি যৌক্তিক পরিণতি, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ এই চায় আল্লাহ্ যেন আমাদের ওপর থেকে তার সদয় দৃষ্টি আর কখনও না সরান, অর্থাৎ গোনাহ্র দরুন তাঁর দৃষ্টি না ফিরান তা নয় বরং গোনাহ্ করার ক্ষমতা অর্থাৎ গোনাহ্ করার সাহসই যেন আমাদের রহিত হয়ে যায়। তারপর আমরা যেন খোদার সদয় দৃষ্টি আমাদের ওপরে এরূপে পড়তে অবলোকন করি যে, তিনি যেন সম্পূর্ণ সুদৃষ্টিতে আমাদের দেখেন। এটা 'আফ্উ' বিরোধী নয়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাউওদ (আঃ) যে এই দোয়া করেন যে, "প্রত্যেক অবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আমায় দেখছেন, আল্লাহ্ আমায় দেখছেন–"সুবহানা মাইঁ ইয়ারানী"– 'পবিত্র তিনি, যিনি সদা আমায় দেখেন,' এর অর্থ এই যে, আমি তো আল্লাহ্র খাতিরে নিজের অন্তঃকরণকে মেজে-ঘষে এরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছি এবং আল্লাহ্ও আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করেন যে, যদি কোন ত্রুটি অবশিষ্ট থেকেও যায় তাহলে (মার্জনাসুন্দর দৃষ্টিতে) তা উপেক্ষা করেন। এমনকি, এখন আমি এই আকাঙ্ক্ষা রাখি যে, প্রত্যেক অবস্থায়, সব দিক দিয়ে আমার অভ্যন্তরের সর্বত্র খোদাতাআলা যেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন এবং সর্বদা আমাকে হিফাযত করতে থাকেন।

অতএব হাদীস বর্ণিত এ সেই দোয়া, যা (এই রাতগুলোতে) চাওয়ার সময় উল্লেখিত বিষয়-বস্তুটি অবশ্যই দৃষ্টিপটে রাখুন। অন্যথায়, যদি এই দোয়া চাওয়া হয় যে, হে খোদা! আমরা গোনাহ্ করতে থাকি আর তুমি তা উপেক্ষা করতে থাকো; তাহলে তা গোনাহ্র আস্পর্ধা উদ্রেকের কারণ হবে। গোনাহ্র প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করবে না। অতএব, এখন উক্ত বিষয়বস্তুটি দৃষ্টিপটে রেখে আমি দোয়াটির পুনরাবৃত্তি করছি। আরবী শব্দ যদি মনে না থাকে তাহলে এর অর্থ ও বিষয়-বস্তু স্মরণ রেখে দোয়াটি করতে থাকুন। "হে আমার আল্লাহ্! তুমি 'আফ্উ'-কারী –"ইন্নাকা আফুয়্যুন।" এর আসল অর্থ, পরিপূর্ণ 'আফ্উ'। 'তুহিব্বুল আফ্-ওয়া'–'আফ্উ'-কে ভালবাস, পসন্দ কর। "ফা'ফু আন্নি" – অতএব তুমি আমার প্রতিও 'আফ্উ' কর (অর্থাৎ সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপে আমার দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা কর এবং সেগুলো সম্পূর্ণ দূর করে আমার প্রতি সর্বদা তোমার পরিপূর্ণ প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। সদা আমাকে হিফাযত কর। উক্ত সব বিষয়-ই 'আফ্উ'-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত-অনুবাদক) এই দোয়াটি যে অর্থে আমি বর্ণনা করেছি যদি আপনারা তা সেভাবে করেন তাহলে এই দোয়াতে আমাদেরকেও স্মরণ রাখবেন। সমগ্র জামাতকে তাতে শামিল রাখুন এবং সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের দোয়ার অন্তর্ভূক্ত করুন। কেননা আমরা চাই এই রমাযানের ফয়েয দ্বারা আহ্মদীয়া জামাত যেন সমস্ত দুনিয়াকে কল্যাণমন্ডিত করে তুলতে সক্ষম হয়।

রমাযানের শেষ দশকের শেষ দিকে একটি শুক্রবার আসবে যাকে মানুষে 'জুমুআতুল বিদা' বলে থাকে এবং এর সম্পর্কে আমি সবসময় বলে থাকি যে, এই শুক্রবারটিকে(প্রকৃতপক্ষে) 'জুমুআতুল ইস্তেকবাল' বলা উচিত, বিদা (বিদায়) নয়, বরং ইস্তেকবাল (সংবর্ধনাজ্ঞাপনমূলক জুমুআ)। অধিকতর আগ্রহ ও আয়োজনে এর সংবর্ধনা করুন। কেননা, ওরূপ জুমুআ (এ বছর) পুনরায় আপনাদের ভাগ্যে জুটবেনা অতএব, এর ইস্তেকবাল বা

সম্বর্ধনা এভাবে করুন যাতে ইহা আপনাদের কাছেই অবস্থান করে অর্থাৎ এর বরকত ও আশিসসমূহ যেন আপনাদেরই হয়ে যায়। অনেক সময় আপনারা বড় লোকদের সম্বর্ধনা দিয়ে থাকেন। তারা আসেন এবং তারপরেই চলে যান। ওটা ইস্তেবালও এবং বিদায়ও। কিন্তু যদি এরূপ প্রিয়জনকে অভ্যর্থনা করেন যাকে নিজের ঘরেই বসিয়ে নেন, সাদরে রেখে দেন, তাকে স্বীয় অন্তর থেকে আর কখনও পৃথক সরে যেতে না দেন তাহলে এই সম্বর্ধনাটি হচ্ছে আরেক ধরনের মর্যাদাপূর্ণ সম্বর্ধনা। অতএব, রমাযানের শেষ দশকের আগামী জুমুআকে আমি এই অর্থে (বিদায়ের পরিবর্তে) সম্বর্ধনামূলক জুমুআ বলে অভিহিত করছি। তাই এর সম্বর্ধনা করুন এরূপে যে, আল্লাহ্‌তাআলা যেন আপনাদের ভালবাসা এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে আপনাদের কাছেই অবস্থান গ্রহণ করেন এবং রমাযানের এই যাবতীয় বরকত ও আশিস যেন সারা বছর ব্যাপী আপনাদেরই হয়ে যায়।

এই ভূমিকার সাথে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি সমূহ উপস্থাপন শুরু করছি। একটি উদ্ধৃতির সামান্য অংশ বর্ণনা করতে পারবো। বাকী ইনশাআল্লাহ্ আগামী জুমাআর খুতবায়।

"যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।" ইহা সেই আয়াতেরই তফসীর, যার কিছু ব্যাখ্যা আমি পূর্বে করে এসেছি। "যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, খোদার অস্তিত্বের উপর দলীল কী? তখন এর জবাব এই যে, আমি অতি নিকটে বিদ্যমান অর্থাৎ বড়ো কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, আমার অস্তিত্ব অতি নিকটতম পথে (বা পন্থায়) বোধগম্য হতে পারে এবং অত্যন্ত সহজ উপায়ে আমার অস্তিত্বের উপর দলীল নির্ণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সে দলীল এই যে, যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার প্রার্থনা শ্রবণ করি এবং স্বীয় ইলহাম (ঐশীবাণী) দ্বারা তাকে সাফল্যমন্ডিত হবার সুসংবাদ দান করি।" এ অর্থটি হচ্ছে, আমি যা উপস্থাপন করেছিলাম তদ্ব্যতীত অপর একটি অর্থ। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ চাও তাহলে তোমরা নিজেরা এরূপ হয়ে যাও যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে আরম্ভ করেন। যখন সাড়া দিতে আরম্ভ করবেন তখন তোমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের দলিলস্বরূপ হবে। যদি তিনি তোমাদের দোয়া না শোনেন অর্থাৎ তোমরা তাঁর থেকে দূরে থাক তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের পক্ষে কোন দলিল হিসেবে উপস্থাপিত হতে পার না। "যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার কথা শুনি এবং স্বীয় ইলহাম দ্বারা তার সফলতার বিষয়ে সুসংবাদ দেই।" এখন, স্পষ্ট যে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হবে রমাযানের এই দশকে, আল্লাহ্ তাকে স্বীয় নৈকট্যের দ্বারা ভূষিত করবেন, তাকে বহু রকম সুসংবাদ রোইয়া সালেহা (সত্যস্বপ্ন), কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) ও ইলহামসমূহের মাধ্যমে দান করবেন। যদ্দারা আমার (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাসই নয়, বরং সর্বশক্তিমান হওয়াও সন্দেহাতীত বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়।" অর্থাৎ কেবল মাত্র এ উপায়েই তোমাদের বোধ গম্য হবে যে, খোদা বিদ্যমান আছেন। বরং যখন তিনি তোমাদের দোয়াসমূহ শ্রবণ করবেন তখন সর্বশক্তিমান হবারও প্রমাণ দিবেন। অর্থাৎ তোমরা তাঁর নিকট যা প্রার্থনা কর তা তোমাদের দানও করেন। অতএব, কুদরত (ক্ষমতা) ব্যতিরেকে কী করে দান করতে পারেন? অতএব, এরূপে দোয়া কর যাতে তা শ্রবণ ও গ্রহণ করেন এবং তাতে তাঁর কুদরতের নিদর্শনও প্রকাশিত হয়।

"কিন্তু মানুষের উচিত যেন নিজেদের মধ্যে তাকওয়া এবং খোদা-ভীরুতার এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে তাদের দোয়া আমি শ্রবণ করি। আর উচিত, তারা যেন আমাতে ঈমান আনয়ন করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তার আগে তারা ইকরার করুক যে, খোদা বিদ্যমান আছেন এবং তিনি সবরকম শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। কেননা, যে-ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে অভিজ্ঞতামূলক তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়।" অতএব, যেহেতু এ উদ্ধৃতিটি ছাড়া অন্যান্য উদ্ধৃতির জন্য এখন আর সময় নেই, সেজন্য ইনশাআল্লাহ্ আগামী খুতবায় নূতন কোন বিষয় বস্তু শুরু করার পরিবর্তে এবিষয়টি-ই অব্যাহত থাকবে এবং পরবর্তী উদ্ধৃতিসমূহ উপস্থাপিত হবে।

(পুনঃ প্রকাশ) অনুবাদ ঃ **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**, মুরব্বী সিলসিলাহ্

৪ পাতার পর অমৃতবাণী

খোদার নামে ব্যয় করেছে। এটা সত্য যে, তার যদি চক্ষু থাকতো তাহলে সে দেখতে পেতো যে, কোন কিছুই তার নয়, সবকিছু খোদাতাআলার, এটা একটা আবরণ, তাকওয়ার ক্ষেত্রে তা অনিবার্য। এই খোদা-ভীরুতার অবস্থার চাহিদাই মুত্তাকীকে দিয়ে খোদার দেয়া (জীবিকা) থেকে কিছু দেওয়ানো হয়েছে। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতের সময় হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘরে কিছ রয়েছে কি ? "জানা গেল একটি দিনার ছিল, বললেন, "একটি জিনিসও নিজের কাছে রেখে দেয়া আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীলতার পথে অন্তরায়। রসূলে আকরম (সঃ) তাকওয়ার স্তর পেরিয়ে যোগ্যতম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলেন। এজন্যই 'মিথ্যা' অর্থাৎ 'তা থেকে যা' শব্দটি তাঁর বেলায় ব্যবহৃত হয় নি। কেননা, ঐ ব্যক্তি অন্ধ যে কিছু নিজের কাছে রেখেছে আর কিছু খোদাকে দিয়েছে। কিন্তু এটা মুত্তাকীর করণীয় বিষয় ছিল, কেননা খোদার পথে দেয়ার ব্যাপারেও নফসের (আত্মার) সাথে তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। যার পরিণতি এই হয়েছিল যে, সে কিছু দিয়েছে আর কিছ রেখেছে। হ্যাঁ, রসূলে আকরম (সঃ) সবকিছু খোদার পথে দিয়েছেন, নিজের জন্য কিছুই রাখেন নি।

যেমন (১৮৯৬ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত) বিশ্বধর্ম সম্মেলনে মানুষের তিনটি অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা মানুষের ওপর এসে থাকে। অনুরূপভাবে এখানেও সম্মানিত কুরআন, যা মানুষকে সকল স্তর অতিক্রম করাতে এসেছে, 'ইত্তেকা' (সাধুতা খোদা-ভীরুতা) দ্বারা শুরু হয়েছে। এটা এক আনুষ্ঠানিকতার (চেষ্টা-কল্পনার) পথ। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র। এর হাতে তরবারী রয়েছে এবং তরবারী দ্বারাও এর মোকাবেলা হবে, যদি বেঁচে যায় তাহলে মুক্তিলাভ করে। অন্যথায় হীন থেকে হীনতর স্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং এখানে মুত্তাকীদের গুণাবলী সম্বন্ধে এটা বলা হয় নি যে, যা যা কিছু আমরা দিই তার সবটাই তারা খরচ করে দেয়। মুত্তাকীর মধ্যে এরূপ ঈমানী শক্তি নেই যা নবীগণের বেলায় হয়ে থাকে সেরূপভাবে আমাদের পরিপূর্ণ নেতা (সঃ)-এর ন্যায় খোদাতাআলার দেয়া সবটাই খোদাকে দিয়ে দেন। এজন্যই প্রথমতঃ সামান্য কিছু ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে, যাতে করে চাটনীর স্বাদ পেয়ে আরো বেশী ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। (চলবে)

অনুবাদ - **মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা**

তিনটি ঈদের প্রকৃত তাৎপর্য

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর ঈদুল ফিতরের খুতবা ২৯ আগস্ট, ১৯৪৬ইং, 'রাখ্শমী' ডেলহৌজীতে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ আজ এ দিনটি মুসলমানদের মাঝে ঈদের দিন বলে অভিহিত। 'ঈদ' শব্দের অর্থ যা পুনর্ঘটিত হতে থাকে। যেহেত আনন্দের অনুষ্ঠান বা উৎসবের ব্যাপারে মানুষ উহার বারংবার আগমনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করে, সেহেতু ঘুরে ফিরে বার বার আসে এরূপ খুশীর নাম ঈদ রাখা হয়েছে। যেমন, আমরা বলে থাকি, "আল্লাহ্তাআলা যেন আপনাকে আনন্দের দিন বার বার দেখান।" আনন্দ মানুষের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপার। যদি অন্তরে আনন্দের সৃষ্টি না হয় তাহলে বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ কোন মূল্য রাখে না। দুনিয়াতে হাজারো মুসলমান এমনও হবে, যারা ঈদ সত্ত্বেও অন্তরে আনন্দ বোধ করছে না। মুসলমানের সংখ্যা জগতে আজ চল্লিশ, কি পঞ্চাশ কোটি (বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ১২৫ কোটি - অনুবাদক)।

তাদের মধ্যে এরূপ সহস্র সহস্র লোক হবে যাদের গৃহে আজ রাতে তাদের কোনও আপন জনের মৃত্যু ঘটেছে। কাজেই এই ঈদ তাদের জন্যে আনন্দের ঈদ নয়। আজ তাদের হৃদয় বিষাদাচ্ছন্ন। যারা নিষ্ঠাবান তারা হয়ত নামাযের জন্য যাবে কিন্তু মনের বিষাদ এই লোক সমাগমের কারণে দূর হবে না। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু না ঝরলেও শোকাহত হৃদয় হতে অবশ্যই রক্ত ঝরবে। কিন্তু এই দুঃখ-বেদনাক্লিষ্ট লোকগণ ব্যতীত অন্যান্যরা ঈদের দিন আনন্দ করে থাকে। তবে এই আনন্দের কারণ কি? মানুষ সচরাচর এজন্যে আনন্দ বোধ করে যে, তার ঘরে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে, অথবা এজন্যে যে, তার কোন পার্থিব বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। মানুষ এজন্যও খুশী হয় যে, তার নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে বা হয়েছে। কিন্তু এসব জিনিষের কোন না কোনটি মুসলমানদের সবাই কি অনিবার্যভাবে ঈদের দিনরূপে পেয়ে থাকে? অবশ্য নয়। ঈদের দিন কি প্রত্যেক মুসলমানের গৃহে সন্তান জন্ম হয়, সে জন্যে সে খুশী হয় ? অথবা তার বিবাহ হয় ? কিংবা প্রত্যেক মুসলমানই কি এই দিন মকদ্দমায় জিতে থাকে, সেজন্যে সে আনন্দিত হয় ? অথবা ধন-সম্পদ পেয়ে যায় ? সাধারণতঃ এসব বিষয়ের জন্যেই মানুষ আনন্দ অনুভব করে থাকে। তবে কী কারণে রমযানের অবসানে মানুষ আনন্দ উদ্যাপন করে ? উহা কী রকম কুরবানী বা ত্যাগ, যার এই ফলশ্রুতি ?..... এরও কোন কারণ হওয়া উচিত যে, ঈদুল-ফিতর রমযানের পূর্বে বা মাঝে অথবা দু'চার দিন পরে আসে না।..... এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, **এই ঈদ রোযা পুরা করার আনন্দস্বরূপ এসেছে। সেজন্যই রমযানের পূর্বে ঈদ রাখা হয় নি; মধ্যভাগেও না। কিংবা বিরতির পরও নয়। রমযানের অব্যবহিত পরেই এর আগমন প্রমাণ করে যে, ইবাদতের পূর্ণতার আনন্দস্বরূপ এই ঈদ নির্ধারণ করা হয়েছে।** কিন্তু কতিপয় লোক একটু-আধটু ত্রুটিপূর্ণ কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করেই ঈদ উদ্যাপন করে নেয়। নিষ্ফল ও ব্যর্থ কুরবানীও করা হয়। কোন

কোন কুরবানী বৃথা ও অযথা এবং একটু-আধটু হয়ে থাকে। যাদের কুরবানী অসম্পূণ হয়ে থাকে, তাদের ঈদও অসম্পূর্ণ ঈদ হয়। যাদের কুরবানী বৃথা ও অযথা হয়ে থাকে, তাদের জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ঈদই নেই। কেননা ঈদুল-ফিতর কুরবানীর পরিপূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ রাখা হয়েছে। কাজেই ত্যাগের পূর্ণতার কারণে ত্যাগ স্বীকারকারীর উচিত আনন্দ উপভোগ করা।

ইসলাম ধর্মে দু'টি ঈদ রয়েছে। বরং তিনটি ঈদ বলা উচিত। জুমুআকেও ঈদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামে আর ঈদ রাখা হয় নি। ঈদুল আযহিয়া (কুরবানীর ঈদ) এই শিক্ষা বহন করে যে, ঐ দিন মানুষ আল্লাহ্তাআলার সঙ্গে এক অঙ্গীকার করে এবং যে অঙ্গীকারের আনন্দস্বরূপ ঐ ঈদ পালন করা হয়। ঈদুল আযহিয়া এই স্বাক্ষর বহন করে যে, জাতি অঙ্গীকার করছে, প্রাণের হোক, কি মালের, তারা সর্বপ্রকার কুরবানী করবে। কোনও কুরবানী হতে বিমুখ হবে না এবং তাতে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না। এই অঙ্গীকারের আনন্দস্বরূপ ঈদুল-আযহিয়ার আগমন ঘটে। আর ঈদুল-ফিতর ঘোষণা দিয়ে থাকে, জাতি ঐ অঙ্গীকার পুরা করে দিয়েছে। জুমআর ঈদ আসে এই আনন্দস্বরূপ যে, আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে একমাত্র ধর্ম দীনে-ওয়াহেদের উপর একত্রিত করে দিয়েছেন। অন্য কথায়, ইহা ঐক্যবদ্ধতার ঈদ। এই তিন ঈদের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এক, জাতি কুরবানী বা ত্যাগ-তিতিক্ষার অঙ্গীকার করবে। দুই, সেই অঙ্গীকার পুরা করে দিবে। তিন, জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

যে-জাতি আল্লাহ্তাআলার পথে প্রাণের কুরবানী, মালের কুরবানী, ইজ্জতের কুরবানী পেশ করে দেয়, তাদের ঈদুল-ফিতর উদযাপনের যথার্থ অধিকার বর্তায়। কেননা আল্লাহ্তাআলা ঐ জাতিকে তওফীক দান করেছেন যে, তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। এর পূর্বে যখন মানুষ অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে, সকল আদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বয়াত করে এবং কুরবানীর অঙ্গীকার করে, তখন সে ঈদুল-আযহিয়ার হকদার হয়ে যায়। অন্য কথায়, **ঈদুল আযহিয়া যেন মু'মিনের জন্য লাভের দিন। ঈদুল-ফিতর তার মৃত্যুর দিন, যখন সে কৃতকার্য হয়ে আনন্দভরে তার খোদার সান্নিধ্যে যায়।** এক আরব কবি বলেছেন, "যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে, তখন তুমি কাঁদছিলে আর মানুষ তোমার চার দিক বসে আনন্দিত হচ্ছিল।" আল্লাহ্তাআলার এই হিকমত যে, সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে কাঁদে। কাঁদার কারণে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয় এবং ফুসফুস ক্রিয়া করতে আরম্ভ করে।

মাতৃগর্ভে ফুসফুসের ক্রিয়া করার অভ্যাস হয় না। কিন্তু আল্লাহতাআলা এরূপ উপক্রম সৃষ্টি করে দেন যে, বাচ্চার জন্মের সময় তার উপর চাপ পড়ে। সেই চাপের কারণে সে কাঁদে ও চীৎকার করে। যার জন্য ফুসফুস ইহার ক্রিয়া শুরু করে দেয়। এই ক্রন্দনের মধ্যেই শিশুর জীবনের স্থিতি নিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারী শিশু মাত্রই কাঁদে। অতি অজ্ঞ মহিলাও জানেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি না কাঁদে, তাহলে তার জীবন সংকটাপন্ন। যার অর্থ হয়ে থাকে, জীবিত বাচ্চার জন্ম হয়েছে, না মৃতের। সে দিকেই ইঙ্গিত করে কবি বলেন ঃ

"তুমি সেই ব্যক্তি যে, তোমার মা যখন তোমাকে প্রসব করেছেন তখন তুমি কাঁদছিলে। আর মানুষ তোমার চারদিক আনন্দভরে হাসছিল।" অথচ সাধারণ নিয়ম হলো, মানুষ ক্রন্দনরত কাউকে দেখে কাঁদতে আরম্ভ করে বা দুঃখ বোধ করে থাকে এবং তার প্রতি সহানুভূতি দেখায়। কিন্তু কবি বলছেন, তোমার অবস্থা ছিল এই যে, তুমি কাঁদছিলে ও চীৎকার করছিলে। কিন্তু চারদিকে মানুষ আনন্দ-উল্লাসে হাসছিল, আর একে অন্যকে মোবারকবাদ দিচ্ছিল যে, পুত্র সন্তান হয়েছে, মোবারক হোক, মোবারক হোক। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, মানুষ যেন তোমার সাথে হাসি-বিদ্রূপ করছিল।

অর্থাৎ –দেখ! তোমার আত্মীয়রা কীরূপে তোমার সঙ্গে বিদ্রূপ করেছিল ও তোমার অবমাননা করেছিল। এখন তুমি যদি ভদ্র ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন হয়ে থাক, তা'হলে তোমার উচিত তাদের কাছে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। বস্তুত তাদের কাছে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তম উপায় হলো, এখন তুমি এরূপ সৎকার্য করে দেখাও যে, তুমি যখন আল্লাহ্‌র সমীপে হাজির হতে যাচ্ছ তখন তুমি হাস, আর এই লোকজন কাঁদতে থাকে।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে তার জীবন নেকী এবং তাকওয়ার সাথে অতিবাহিত করে তার সৃষ্টি-কর্তার সান্নিধ্যে যাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে সে পুরস্কার ও কৃপা লাভ করবে কিন্তু পৃথিবীর মানুষ পরলোকগমনকারী ব্যক্তির জন্যে কাঁদে এই বলে যে, সে তাদের কল্যাণকামী ছিল, যে তাদের সাথে সদাচরণ করতো এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সময় তাদের কাজে আসতো– সে তাদের কাছ থেকে আজ বিদায় গ্রহণ করেছে। এখন তার স্থলবর্তী কে হবে? অতএব মানুষের জীবনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য আসে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দু'টি উপলক্ষ্য। এক, যখন সে জন্ম গ্রহণ করে। দুই, যখন সে মৃত্যু বরণ করে। যদি জন্ম গ্রহণকারী সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় জন্ম হয়, তাহলে ইহা গৃহবাসীদের জন্যে ঈদস্বরূপ হয়। আর যদি পরলোকগত ব্যক্তি কৃতকার্যতার মধ্য দিয়ে মারা যায়, তা'লে ইহা পরলোকগত ব্যক্তির জন্যে ঈদস্বরূপ হয়। **বস্তুত ঈদুল আযহিয়া মুসলমানদের জন্যে এক প্রকার জন্মলাভের ঈদস্বরূপ, যখন আমরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসরণে ছাগ বা অন্যান্য পশু কুরবানী দিই, এই কুরবানী একথার আলামতস্বরূপ হয়ে থাকে যে, কুরবানীর এই ছাগ বা পশুগুলির ন্যায় প্রয়োজন হলে আমরা আমাদের বাসনা-কামনা ও প্রাণ আল্লাহ্‌তাআলার পথে কুরবান করে দিব এবং যে কোনও প্রকারের কুরবানীই হোক তা থেকে আমরা কুণ্ঠিত হবো না। আমাদের এই অঙ্গীকার গ্রহণের পর আনন্দ-উৎসব উদ্‌যাপন করা এমনই হয়ে থাকে যেমন শিশুর জন্মের পর মা-বাবা আনন্দ উদযাপন করেন এবং ঐ শিশুর সাথে অনেক বড় বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত করেন।** তারা আশা রাখেন যে, এই সন্তান তাদের জন্যে বরকতের কারণ হবে, অথচ কোন কোন সন্তান বড় হয়ে মা-বাপের ভীষণ অবাধ্য হয় এবং তাদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু তাদের জন্মের সময় তাদের পিতা-মাতা মনে নেক আশাই পোষণ করে থাকেন। ঈদুল-আযহিয়া আমাদের রূহানী জন্মের দিনস্বরূপ হয়ে থাকে। সেদিন আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী পেশ করার অঙ্গীকার করি।

ঈদুল-ফিতর পালন করে আমরা একথা ঘোষণা করি যে, আমরা যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা পূরণ করে দিয়েছি। আর **জুমুআর দ্বারা আমরা এ কথার ঘোষণা করি যে, আমরা এক হাতের উপর একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ আছি।** জুমুআর ঈদ বার বার উদযাপন করা নির্ধারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্য দু'টি ঈদের মাঝে অনেকটা বিরতি ও ব্যবধান রাখা হয়েছে। এর কারণ এই যে, ঐ দুই ঈদ অঙ্গীকার ঘোষণা এবং উহা পূর্ণ হওয়ার ঘোষণাস্বরূপ হয়ে থাকে। বস্তুত জাতীয় অঙ্গীকার গ্রহণের সময় দুরবর্তী হয়ে থাকে। আর জাতীয় অঙ্গীকার বাস্তবায়ন দুই-এক দিনেই সম্পন্ন হয় না; বরং এর জন্যে কোন সময় বহু মাসের, আবার কোন সময় বহু বছরের প্রয়োজন হয়। কখনও শতাব্দীর চতুর্থাংশে, আবার কখনও দুই/তৃতীয়াংশে গিয়ে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। কিন্তু একত্রিকরণ ও ঐক্যবদ্ধতা এমন এক বিষয়, যার প্রয়োজন প্রতি দিন ও প্রতি সপ্তাহেই হয়। সেজন্যে এই ঈদ (জুম্‌আ) উয্‌যাপন সপ্তাহান্তর রাখা হয়েছে, যাতে বার বার এই অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং এর দ্বারা আমরা একত্র ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। কিন্তু কুরবানীর জন্যে অঙ্গীকার করা এবং উহাকে পুরা করা – এ দু'টি কখনও কখনও হয়। সেজন্যে বছরে একবার ঈদুল-আযহিয়া এবং একবার ঈদুল-ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোন কোন লোক এইসব কিছুকেই পিছনে ফেলে অর্থাৎ অঙ্গীকার করা বা উহাকে পুরা করার বিষয়কে উপেক্ষা করে ঈদ উদ্‌যাপনের জন্যে সবার অগ্রভাগে থাকে। কাদিয়ানে এক বন্ধু এই ধরনেরই ছিলেন। না তিনি মসজিদে আসতেন, না রোযা রাখতেন। কিন্তু ঈদের দিন সবার চেয়ে উঁচু এক বিঘত সমান পাগড়ীর শিখা রেখে, সুগন্ধি মেখে সবার চাইতে আগে গিয়ে বসার চেষ্টা করতেন। মানুষ প্রায়শঃ তাঁর সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বা কৌতুক করে বলতো, "বাহ্ ! বেশ তো ! রোযাও রাখেন নি, নামাযও পড়েন নি। তবুও ঈদের দিন সবার আগে এসে বসে পড়েছেন। এ ধরনের ঈদ কোনও ঈদ নয়। রোযা রাখলে না, কোনও ফরয আদায় করলে না, তবে ঈদ কিসের ?

ঈদ উদ্‌যাপনের কেবল তিনটিই উপলক্ষ্য। প্রথমতঃ গোটা জাতি যেন কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষার অঙ্গীকার করে। দ্বিতীয়তঃ জাতি ঐ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন সুসম্পন্ন করে। তৃতীয়তঃ সমগ্র জাতি নিজেদের মধ্যে ঐক্যের প্রেরণা (Spirit) সৃষ্টি করে এবং এক হাতের উপর একত্রিত হয়। এই সেই তিন উপলক্ষ্য যা ঈদ বলে অভিহিত হবার যথার্থ অধিকার রাখে। উক্ত তিন ঈদে মুসলমানদের এ সবক দান করা হয়েছে যে, মুসলমানদের উচিত সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। উক্ত তিন ইবাদতই ইসলাম সম্মিলিত ও সমবেতভাবে পালনের আদেশ দিয়েছে এবং এ উপলক্ষ্যগুলিতে মুসলমানদেরকে এই উপদেশ দিয়েছে যে, অন্যান্য জাতির ন্যায় তোমরাও নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তিগত রূপ দিও না। অন্যান্য সকল জাতিই এরূপ, যাদের ধম সৃষ্টিকর্তার ধর্ম নয়। তারা কেবল প্রচলিত প্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা-স্বরূপ ঐসব ধর্মমতকে ধরে রেখেছে। হিন্দু বা খৃষ্টান ধর্মমতের অনুসারী যদি আজীবন একবারও ইবাদত (উপাসনা) না

করে তবুও সে ধর্মভ্রষ্ট হয় না। খৃষ্টান সপ্তাহে দৈনিক ইবাদতের পরিবর্তে সপ্তাহে এক দিন গির্জায় যায়। গান-বাজনা করে, যেন এই গান-বাজনাই খৃষ্টানদের ইবাদত। পরিশেষে পাদ্রী-ইঞ্জিলের কোনও অংশ পড়ে দেয়। আর অন্যরা সবাই 'আমেন' বলে বেরিয়ে যায়। আবার প্রত্যেক সপ্তাহে গির্জায় কারও আসা বা না আসা জরুরীও নয়। সে আসুক বা না আসুক তার ইচ্ছা। কোন নিষ্ঠা নেই, কোনও তাকওয়া নেই। কারও জন্যে কোচ, কারও জন্যে চেয়ার নির্দিষ্ট আছে। প্রত্যেকে তার চেয়ার ও কোচের ভাড়া পরিশোধ করে। যদি সে না আসে, তাহলে তার আসন খালি থাকে। অন্য কেউ উহাতে বসতে পারে না। আপনারা নিজেদের নামাযের সঙ্গে এর তুলনা করে একটু কল্পনা করলে দেখতে পাবেন যেন টাক মাথার মত কোথাও চুল আছে, কোথাও নেই। এক সাড়িতে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এদের মাঝখানে আবার দু'জন মানুষের ফাঁক, এরপর চারজন দাঁড়িয়ে আছে, আবার চারজনের শূন্যতা। এটা সমষ্টিগত ইবাদত নয়, বরং এটাকে ইবাদত বলে অভিহিতই করা যায় না; এ জন্যে যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ আসন নির্দিষ্ট করে রেখেছে। প্রত্যেকে নিজের ঠিকানা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। ইসলামের আদেশ হলো, যে ব্যক্তি প্রথম আসে তার আগে বসার অধিকার রয়েছে। যে পরে আসবে তার উচিত পিছনে বসা। **মসজিদে সব মানুষ সমান। মসজিদে একজন বাদশাহ্ ও একজন মেথরের মধ্যে কোনও পার্থক্য বা বৈষম্য নেই। যে প্রথমে আসে সে সামনে বসবে। যদি বাদশাহ দেরীতে আসেন, তিনি পিছনেই বসবেন।** সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তা স্বতন্ত্র ব্যাপার যেমন, এক ব্যক্তি দাঙ্গা-ফাসাদের মতলবে আসে, অথবা কোন ব্যক্তি হট্টগোল করে, তাকে পিছনে সরিয়ে দেয়া যায় যাতে ইমামের অনিষ্ট না হয়। এরূপ অবস্থা ছাড়া খোদার গৃহে সকল মানুষই সমান। অন্যের উপর কারও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যখন আমি হজ্জ করতে গেলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, কা'বা মসজিদের অঙ্গণের প্রান্তে এক জায়গায় হুজরা নির্মিত আছে। আমাকে জানানো হলো যে, এই হুজরা এইরূপে তৈরী হয়েছিল যে, এক বাদশাহ্ যখন মসজিদে এসে বসলো তারা পাশে কোন নোংরা ব্যক্তি - যে ছিল ডোম, সে-ও এসে বসে পড়লো। বাদশার সিপাহীরা তাকে তুলে দিতে চাইলো, কিন্তু সে উঠে যেতে অস্বীকার করলো। সিপাহীরা যখন তার উপর বেশী চাপ দিল, তখন যত মুসল্লী ছিল তারা সকলে উঠে দাঁড়ালো। তারা বললো, আমরা খোদার নামায পড়তে এসেছি। বাদশার নামায পড়তে আসি নি। মসজিদের ইমামও নামায পড়াতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে বাদশাহ্‌কে নতি স্বীকার করতে হলো। এরপর ঐ বাদশাহ্ নিজের জন্যে মসজিদ অঙ্গণের পিছন দিকে একটি হুজরা তৈরী করলেন, যেখানে তিনি নামায আদায় করতেন। কিন্তু তিনি হুজরা তৈরী করিয়ে নিজেরই কান কাটালেন। কার কি ক্ষতি হলো ? কেননা কা'বার মসজিদের সওয়াব থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। এরপর আরো কতিপয় বাদশাহ্‌ও মসজিদের পিছন দিকে হুজরাসমূহ তৈরী করিয়েছিলেন। সেগুলোতে তারা নামায পড়তেন। কিন্তু মসজিদে কোন স্থান তারা নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হন নি। অতএব ইসলামই একমাত্র এরূপ ধর্ম, যাকে আমরা সামষ্টিকতার ধারক ও বাহক বলে অভিহিত করতে পারি। এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই তিন ঈদ এজন্যে রাখা হয়েছে, যাতে তারা প্রয়োজনের সময় জাতীয় অঙ্গীকার গ্রহণে সচেতন থাকে। তারপর ঐ অঙ্গীকার জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে যত্নবান থাকে। অতঃপর জাতীয় ঐক্যকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে এবং দুশমন যেন কোন অবস্থাতেই তাদের মধ্যে ফাটল ধরাতে না পারে এবং মতভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম না হয়।

এই তিন ঈদকে রূহানী রূপ দিয়ে লও। মানুষের রূহানী জন্মের রূপ হলো এই যে, সে যেন কোন পুণ্যবান ব্যক্তির হাতে বয়াতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় এবং তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও ঐক্যের বন্ধন স্থাপন করে। এই অঙ্গীকার করে যে, সে আজীবন আল্লাহ্‌তাআলার ফরমাঁবরদার (আজ্ঞানুবর্তী) হয়ে থাকবে। ইহা তার ঈদুল-আযহিয়া। যদি সে তার এই অঙ্গীকারকে পুরা করে এবং নেকী ও তাকওয়ার সাথে জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যখন সে খোদাতাআলার সমীপে পেশ হয়, তখন সে তার কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হয়। ইহা হলো তার ঈদুল-ফিতর। ঈদুল-জুমুআ হলো, মানুষ যেন আল্লাহ্‌তাআলার সাথে তার যোগ-সম্পর্ক ছিন্ন না করে। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে-সর্বাবস্থায় দৃঢ়পদক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই হলো তিন রূহানী ঈদ এবং এই হলো সেই তিন অবস্থা বা উপলক্ষ্য, যার কারণে মুসলমানদের উৎফুল্ল ও আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু এইসব বিষয় যদি মুসলমানরা হারিয়ে ফেলে। এসব যদি তাদের মধ্য হতে তিরোহিত হয়, তাহলে সে অবস্থায় তাদের ঈদ উদযাপন আসলে কেবল মেলায় যোগদানের তুল্য এবং নিছক নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মেলা ও উৎসবগুলি থেকে এই সব ঈদের কোন পার্থক্য নেই। আজ মুসলমান এই ঈদসমূহের হিকমত (তাৎপর্য) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে পড়েছে। এসব কেবল মাত্র তাদের মেলায় যোগদানের মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঈদগাহ্‌গুলোর কাছে অথবা তাদের রাস্তা-ঘাটে কেউ ডুগডুগি বাজিয়ে বানর নাচায়। কেউ বা ভালুকের খেলা-তামাশা দেখায়। কেউ বড়া ও পাকোড়া বানায়। কেউ বাঁশী বাজায়। কিছু সংখ্যক কুশ্‌তি লড়ে। আর এই সব করার পর মুসলমান মনে করে বসে যে, ঈদ হয়ে গেল। যেন এক ধরনের মেলায় উপস্থিত হয়েছিল, যা তারা খেলা ও তামাশার মধ্য দিয়ে পার করে দিল। ঈদের প্রকৃত হিকমত তাদের মাথায় উপস্থিত হয় না। কিন্তু আমাদের জামাতের **প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা করা উচিত এবং প্রত্যেকের আত্ম-পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত যে, তার জন্যে কি এই উপলক্ষ্যসমূহ প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার অর্থে আনন্দের কারণ, না তার মধ্যে এমনও কিছু দুর্বলতা ছিল, যার কারণে তার একটি ঈদ তো সঠিক ও যথার্থ, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঈদ সঠিক ও যথার্থ নয়। যে দুর্বলতার কারণে তার ঈদ সঠিক হয় নি, তার জন্যে তার উচিত, ঐ দুর্বলতা যেন তার মধ্যে আর না থাকে।** যদি প্রত্যেক আহমদী সচেতনভাবে অনুভব করে যে, তার প্রাণের কুরবানী, তার মালের কুরবানী ও তার সম্মানের কুরবানী দিতে তার কোনও দ্বিধা-সংকোচ নেই, তাহ'লে বুঝে লও যে, তোমাদের ঈদুল-আযহিয়া সঠিক ও সার্থক হয়েছে। যদি তোমরা জান, মাল ও সম্মানের কুরবানী পেশ করে দিয়ে থাকো এবং অঙ্গীকার পুরা করে দিয়ে থাকো, তাহ'লে বুঝবে যে, তোমাদের ঈদুল-ফিতর সঠিক ও সার্থক হয়েছে। আর যদি আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে তোমাদের নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সর্বদা এ বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে যে, তোমরা জামাতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, কোন অবস্থাতেও এবং কোন পরীক্ষাতেও তোমরা জামাতকে ত্যাগ কর না, তাহ'লে বুঝবে যে, তোমাদের ঈদুল-জুমুআও সার্থক হয়েছে। এই ত্যাগ ও কুরবানী ঈদুল-

জুমুআ বলে অভিহিত হতে পারে। নচেৎ, সপ্তম দিবসে একবার এসে আধ ঘন্টা বসে চলে যাওয়া, তারপর মনে করা, আমরা জুমুআ পালন করেছি, তাহ'লে ইহা আদৌ কোন মূল্য রাখে না। ভোগ-বিলাস ও কুকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা আধ ঘন্টা কেন, তিন চার ঘন্টাও নর্তকীদের নাচ উপভোগ ও গান শ্রবণে অতিবাহিত করে। আমরা কি মনে করতে পারি যে, তারা অনেক কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করে ? অতএব, এক-আধ ঘন্টার উক্ত কুরবানী কোন কুরবানীই নয়। **বরং জুমুআর মূল-তত্ত্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উহা কার্যতঃ অনুশীলন করলে তবেই উহা প্রকৃতপক্ষে ঈদুল-জুমআ বলে গণ্য হবে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, দৃঢ়সংকল্পের সাথে এ কথার উপর বদ্ধপরিকর হওয়া যে, যত বিপদ ও বাধা-বিপত্তিই আসুক যত সঙ্কট ও পরীক্ষার সম্মুখীনই হতে হোক, সে জামাত থেকে কখনও দূরে সরে যাবে না।**

আমাদের জামাতের এ বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত যে, আমরা এখনও প্রারম্ভিক কালে আছি। অন্য কথায় আমাদের উপর যৌবন কাল আসতে যাচ্ছে। যুবকদের উচ্চসাহস ও উদ্যম হয়ে থাকে। তারা নিজেদের সংকল্পে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বর্তমান কালে কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামাতই এমন একটি জামাত, যাদের ঈমান তাজা এবং সজীব। যাদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা উঁচু ও উন্নত এবং তারা আল্লাহ্‌তাআলার নিত্য নতুন নিদর্শনাবলী দেখতে থাকে। খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তিত হয়ে উনিশ' বছর হয়ে গেছে সেজন্যে ইহার উপরও বার্ধক্য ভর করেছে। তেমনি ইসলামে অন্যান্য সব ফির্কাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে কারও সাত শ' বছর কারও নয় শ' বছর হয়ে গেছে। বর্তমানে একমাত্র জামাতে আহমদীয়া এরূপ এক জামাত, যারা এখন আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য ও সহায়তা দ্বারা সমর্থিত এবং যুবকদের মত তাদের উচ্চ সাহস উদ্যম ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। অতএব, জামাতের চেষ্টা করা উচিত, যাতে তাদের মধ্যে উক্ত - তিন প্রকারের ঈদের সার্বিক ও সমষ্টিগতভাবে সমাবেশ ঘটে এবং তাদের প্রত্যেকের ঈদ পরিপূর্ণ ঈদ হয়। জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির এই অঙ্গীকার করা কর্তব্য, যে কুরবানীরই প্রয়োজন হবে, সে কুরবানী সে প্রদান করবে এবং যত পরীক্ষাই তাকে দিতে হয় দিবে কিন্তু জামাতের আঁচল সে কখনও ছাড়বে না।

আল্লাহ্‌তাআলার কাছে এই দোয়া, তিনি যেন আপনাদেরকে প্রত্যেক ময়দানে দৃঢ়পদ এবং প্রত্যেক কুরবানীতে অধিকতর অংশ গ্রহণের তওফীক দান করেন। আপনাদের ঈদ প্রকৃত ঈদ হোক, আমীন। (পুনঃপ্রকাশ)

(আল-ফযল ঃ ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ইং)

অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কবিতা

অবাধ্য কণ্ঠস্বর

হে পৃথিবীর হিংস্র মানুষেরা
যতই চেষ্টা কর তোমরা
কখনো পারবে না আমাকে থামাতে
আমি ছুটে যাব পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে
শহরে বন্দরে হাটে বাজারে।
তোমরা সহস্র দানব শক্ত করে মুখ চেপে ধরে
পারবে কি আমাকে চুপ করাতে ?

মনে নেই ? –রমযানে তারাবী নামায সেরে
তোমরা ক'জন মরদে মোজাহিদ রাতের আঁধারে
আমাকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে
ইচ্ছামত পিটিয়েছিলে।
(তোমাদের জেহাদী পায়ের জুতোর দাগ
এখনো রয়েছে মোর বুকে)
টেনে নিয়ে গিয়েছিলে কান ধরে টয়লেটে
(এ তোমাদের আচ্ছা জেহাদী নমুনাই বটে!)
'মাহ্‌দীর' আগমন নিয়ে লেখা **'মহাসুসংবাদ'** বইটা
নাপাক জায়গায় রেখে বলেছিলে,
–'এখানে মলত্যাগ কর ব্যাটা!'
তোমাদের দু'জন বাইরে অপেক্ষা করেছিলে
মনে নেই হঠাৎ ঝোঁপ থেকে বের হয়ে বিষাক্ত সাপ
এসেছিল তেড়ে ?
তখন কেন পালিয়ে ছিলে চিৎকার করে ?

দাঁত কড়মড় করে, চোখ লাল ক'রে
পেঁচার মত বিষাক্ত উল্লাসে
আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
চুপ করাতে পারবে কি আমাকে ?
আমি চেঁচিয়ে উঠব বারে বারে
'ইমাম মাহ্‌দীর' আগমন সংবাদ জানাব সবাকে।

ফিস্‌ফিসিয়ে তোমরা বলেছিলে সে রাতে,
–'যদি মরেই যায় মারের চোঁটে
লাশ টাঙ্গিয়ে রেখে গাছে
'সুইসাইড' বলে প্রচার করবো পাছে।'
বড় অদ্ভুত তোমাদের জেহাদী নমুনা!
ইসলাম! ইসলাম! বলে মুখে তোল ফেনা।

ওরে ও ভন্ড আলেম! তোরাতো যালেম,
ছদ্মবেশে তোরা দুশমন ইসলামের।
অন্ধ দালাল তোরা খ্রীষ্টানদের।
ভাল করে দেখে নে তোদের ভেতরটা,
মিথ্যে তোদের বাইরের লেবাসটা।

আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই
আমি জানি আল্লাহ্ তো রয়েছেন মোর সাথেই
কি করতে পারবে আমাকে ?
লাশ বানাবে ? টুকরো টুকরো করবে ?
আমার লাশের টুকরোগুলো উঠে আসবে
একশ' কবর থেকে–
আগ্নেয়গিরির লাভার মত উৎক্ষিপ্ত হবে
আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে
কিছুতেই স্তব্ধ করতে পারবে না
আমার অবাধ্য এ কণ্ঠস্বর।

- এম, এ, আউয়াল

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত খুতবা জুমুআ ১১ আগস্ট, ২০০০ইং মসজিদে-ফযল লন্ডন]

হুযূর (আইঃ) তাশাহ্হুদ, তাআওউয, এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর বলেন, দোয়ার ধারাবাহিক বিষয়-বস্তু এ খুতবাতেও চলবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরবী দোয়া এবং আরবী ও ফার্সী কবিতার দোয়াসমূহের কেবল অর্থ উপস্থাপন করা হবে। তেমনি তাঁর (আঃ) গদ্যের উদ্ধৃতিসমূহও নির্বাচন করা হয়েছে।

তিনি (আঃ) তাঁর আরবী কাব্যে আল্লাহ্তাআলার সমীপে নিবেদন করেছেন, "হে চিরস্থায়ী, হে হেদায়াতের প্রস্রবণ ! তোমা থেকেই শক্তি লাভ হয়, সুতরাং আমাকে তোমার প্রশংসা কীর্তন করার শক্তি দান কর। তুমি সেই বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিয়ে থাক, যে প্রকৃত তওবা করে আর তুমিই পথভ্রষ্টতার নিপতিত দুষ্টকে পরিত্রাণ দিয়ে থাক। তোমার ক্ষমার সম্মুখে বড় থেকে বড় পাপও একটি সাধারণ বিষয়। সুতরাং সেই বান্দার সঙ্গে তোমার কী ব্যবহার হবে যে কিনা সংশয়ের মাঝে ছোট পাপে নিপতিত হয়েছে। তুমি বিশ্ব-জগতের বাস্তবতা এবং গোপনীয়তা সম্পর্ক সম্যক অবহিত। তুমি সোজা এবং বাঁকা রাস্তা সম্পর্কে জ্ঞাত। হে আমার উপাস্য এবং আশ্রয়স্থল আল্লাহ্ ! আমরা তোমার বান্দা, আমরা তোমার সম্মুখে ভয় এবং দাসত্বে সেজদারত। তুমি স্বীয় ফযল এবং রহমতের দ্বারা বিরান ভূমিকে সজীবতা দান করে থাক, স্বীয় প্রতাপের দ্বারা সুউচ্চ শান শওকতপূর্ণ অট্টালিকাসমূহকে মাটিতে মিশিয়ে থাক। দয়া এবং কুদরতে তোমার ন্যায় কোন দৃষ্টান্ত নেই। হে আমার প্রতিপালক ! তোমার ন্যায় কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি খুঁজে পাই নি।

পবিত্র সেই সত্তা যিনি সকল সৃষ্টিকে বাস্তবে রূপ দান করেছেন এবং ছড়ানো ছিটানো অণু-পরমাণুকে এক অস্তিত্বে রূপ দান করেছেন, তিনি আত্মাভিমান, অত্যাচারীদেরকে স্বীয় শাস্তির দ্বারা ধ্বংস করে থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল তওবাকারীদেরকে ধ্বংস থেকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন। তুমি আমার উপাস্য, আশ্রয়স্থল, লক্ষ্যস্থল। তুমি ছাড়া আমার শত্রুদের ধ্বংস করার আর কেউ নেই। তোমার উপরই আমরা নির্ভরশীল। তুমি আমাদের পরিত্রাণকারী, আমরা ব্যথিত হয়েছি, আমরা তোমার ক্ষমার জন্য এসেছি" (কিরামাতুস সাদেক্বীন)।

হে সেই সত্তা! যে স্বীয় নিয়ামতের দ্বারা নিজের সৃষ্টিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছ, আমরা তোমার প্রশংসা করছি, কিন্তু প্রশংসা করার শক্তি নেই। আমার প্রতি দয়া এবং ভালবাসার দৃষ্টি দাও। হে আমার আশ্রয়স্থল! হে দুঃখ - কষ্টকে লাঘবকারী তুমিই আশ্রয়স্থল, তুমিই এ দুনিয়া এবং পরকালে আমাদের আত্মাসমূহের নিরাপত্তাস্থল। আমরা অন্ধকার যুগে বিপদ দেখেছি, তুমি দয়া করে আমাদেরকে জ্যোতির্ময় ঘরে প্রবেশ করিয়ে দাও। তুমি

তওবার মাধ্যমে বড় পাপসমূহকে ও ক্ষমা করে থাক। তুমিই মানুষের কাঁধের ভারী বোঝা থেকে পরিত্রাণ দাও। তুমি আমার ভরসা, তুমি আমার আত্মার কাঙ্ক্ষিত স্থল, তোমার উপরই আমার সমস্ত আশা এবং ভরসা। তুমি আমাকে ভালোবাসার সরাবের পেয়ালা দান করেছ যাতে আমি পেয়ালার পর পেয়ালা পান করেছি, আমি তো মৃত্যু বরণ করব, কিন্তু আমার ভালোবাসা অমর থাকবে, কবরের মাটিতেও আমার আওয়াজ তোমার স্মরণের মাধ্যমে চেনা যাবে।

আমার চক্ষু তোমার ন্যায় কোন দয়াশীল দেখে নি। হে দোয়াতে ব্যাপকতা সৃষ্টিকারী এবং নেয়ামতের অধিকারী ! তুমিতো আমার আত্মার লক্ষ্যস্থল ছিলে। কলমের প্রত্যেক চরণ এবং লিখিত বাক্যে যখন আমি তোমার মেহেরবানী, দয়া ও ক্ষমা দেখেছি তখন বিপদ দূরীভূত হয়ে গেল আর এখন আমি স্বীয় বিপদকে অনুভবই করি না। হে আমার প্রতি-পালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি এক-অদ্বিতীয় আকাশের প্রতিপালক এবং মাটির পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আমি সেই সমস্ত কিতাবের উপর বিশ্বাস আনয়ন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ এবং সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতেও, যার খবর তুমি দিয়েছ।

হে আমার ভরসাস্থল ! আমাকে রক্ষা কর, কেননা তুমিই আমার সরংক্ষক। হে আমার আশ্রয়স্থল, তুমি আমাকে কু-চক্রীর কু-চক্রী এবং অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি স্বীয় ফযলে আমাকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর এবং সেই ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ নাও যে ধর্মকে মাটিতে পুঁতে। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের মাঝে সম্মানজনক সিদ্ধান্ত ক'র, হে সেই সত্তা যিনি আমার হৃদয়, বাইর এবং ভিতরের বাস্তবতাকে দর্শনকারী, হে সেই সত্তা। যাঁর দ্বার আমি ভিখারীদের জন্য খোলা দেখছি আমার দোয়াকে রদ কর না" (মিনানূর রহমান)।

অতঃপর "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সাহায্য কর, স্বীয় ফযল এবং প্রতিশোধে সেই ব্যক্তি থেকে বদলা নাও, যে সত্যকে খড়-কুটোর ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করে। হে আমার প্রতি-পালক! আমার জাতি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিপতিত হয়েছে, তুমি দয়া কর এবং তাদেরকে জ্যোতির্ময় ঘরে নিয়ে আস। হে আমাকে ভর্ৎসনাকারীগণ ! পরিণাম মুত্তাক্বীদের স্বপক্ষে হয়ে থাকে, সুতরাং তোমরা জ্ঞানীর ন্যায় এ বিষয়ে পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা কর। আমাকে অভিসম্পাতকারীগণ ! নিশ্চিত জেনে রাখ তত্ত্বাবধায়ক খোদা সব কিছু দেখছেন, তোমরা আমার প্রভু-প্রতিপালক সর্ব শক্তিমান খোদার প্রতাপকে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের দলকে লাঞ্ছিত করবেন এবং আমাকে সম্মানিত করবেন। এমন কি সকল মানুষ আমার পতাকার নীচে এসে যাবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মাঝে সদয়চিত্তে সিদ্ধান্ত কর। হে সেই সত্তা, যে আমার হৃদয় এবং অভ্যন্তর সম্পর্কে জ্ঞাত, হে সেই সত্তা, যার

দ্বারা আমি ভিখারীদের জন্য খোলা দেখছি সুতরাং তুমি আমার দোয়া রদ করো না" (আঞ্জামে আথম)।

অতঃপর অন্যত্র আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে নিবেদন করেন, "আমরা শত্রুর অন্যায় কষ্ট থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি। নির্যাতনের রাত্রগুলি দীর্ঘায়িত হয়ে গিয়েছে। হে আমার প্রতিপালক! তুমি দয়াশীল, তুমি আমাকে সাহায্য কর,তুমি মেহেরবান এবং রহমতের অধিকারী। তুমি স্বীয় বান্দাদের বিধস্তকারী দুঃখ-কষ্ট হতে রক্ষা কর, তুমি অনেক বিষয়ে আমাদের ভ্রান্তি এবং বাড়াবাড়িকেও দেখেছ সুতরাং ক্ষমা কর, সাহায্য কর এবং শক্তি দান কর। তুমি দয়ালু, মেহেরবান প্রভু এবং সদয় ব্যবহার প্রদর্শনকারী সুতরাং তুমি এই বান্দাদের নির্বাচিত করার পর ভর্ৎসনা কর না। আমরা তোমার নিকট মৃতের ন্যায় এসেছি সুতরাং আমাদের বিষয়াবলীকে জীবন দান কর। আমরা তোমার থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি, সাহায্যের নিবেদন করছি সুতরাং তুমি ক্ষমা কর।

হে আমার প্রেমাস্পদ ! তুমি আমাকে কোন্ দরজার দিকে ঠেলে দিবে ? তুমি কি আমাকে ক্ষতিকারক শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবে ? হে আমার উপাস্য, আমার প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গীত। তুমি আমার ভরসাস্থল। স্বীয় ফযল নিয়ে আগমন কর এবং আমাকে শুভ সংবাদ দাও। হে খোদা! ইতায়াতের মাঝেই আমি সমস্ত শুভ কল্যাণ পেয়েছি। অন্যদেরও নিষ্ঠার তৌফীক দান কর এবং সহজতর কর। হে আমার খোদা ! তুমি স্বীয় সত্তায় রহমের বদৌলতে এ বান্দাকে সাহায্য কর। স্বীয় দুর্বল এবং অসহায় বান্দার অস্বীকার প্রতিপন্নের বিরুদ্ধে সাহায্যার্থে এগিয়ে আস। এর পূর্বেও তুমি আমার দোয়াসমূহ কবুল করেছ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার হেফাযত করেছ এবং আশ্রয়স্থল ছিলে। হে আমার খোদা ! আমার ফরিয়াদ কবুল কর হে আমার খোদা ! আমায় সাহায্যকর, মেহেরবানী করে আমার আকাঙ্ক্ষার শুভ সংবাদ দাও এবং আমাকে জ্ঞাত কর। আমাকে স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় কর, হে আমার আশ্রয়স্থল এবং ঠিকানা ! আমরা সমাগত রাত্রির অন্ধকার থেকে তোমার সত্তায় আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক ! পুণ্যের শত্রু ও দুষ্টদেরকে গ্রেফতার কর এবং সত্যের খাতিরে তাদের উপর আযাব নাযিল কর এবং ধ্বংস কর।

হে আমার প্রতিপালক, ! তুমি মেহেরবানী কর, যেভাবে তুমি সব সময় মেহেরবানী করেছ, আমি দায়িত্ব ভুলে গিয়ে থাকলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও, নিশ্চিৎ তুমি কৃপাময় প্রভু এবং দয়ালু। তুমি স্বীয় দাসদের লজ্জার দিন দূর করে দাও। আমি অত্যন্ত ভয়ানক কাল রাত্রি দেখতে পাচ্ছি সুতরাং তুমি কল্যাণ দাও এবং অতি উত্তম দিনের শুভ সংবাদ দাও। হে আমার দয়ালু ! আমার দুঃখের দিন শেষ করে দাও এবং আমাকে পরিত্রাণ দাও। হে আমার খোদা ! আমার শত্রুদের টুকরো টুকরো করে দাও এবং মাটিতে মিশিয়ে দাও। আমার চিন্তাবলী তোমা থেকে গোপন নেই এবং তুমি আমার গোপন বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞাত। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল সম্পর্কে অবহিত। তোমার স্বচ্ছ পানি আমার প্রয়োজন, তুমি সেই ঝর্ণাকে প্রবাহিত করে দাও। তোমার প্রতাপ আমার লক্ষ্য সুতরাং সাহায্য কর এবং স্বীয় প্রতাপ প্রদর্শন কর। আমরা যখন তোমাকে না চাইতে দানকারী পেয়েছি এরপর কিসের চিন্তা। আমরা অন্ধকার যুগ থেকে তোমার জ্যোতিঃ কামনা করছি। আমাদের শেষ নিবেদন, সমস্ত প্রশংসা দয়ালু সর্বশক্তিমান স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টিকারী প্রতিপালকের জন্য" (সিররুল খেলাফা)।

অতঃপর তাঁর (আঃ) দোয়া, "আমরা শত্রু দ্বারা নির্যাতনের কষ্ট সহ্য করেছি আর নির্যাতনের রাত্রিগুলি দীর্ঘায়িত হয়ে গিয়েছে, হে খোদা সাহায্য কর। আমরা মৃতের ন্যায় তোমার নিকট এসেছি সুতরাং আমাদের কর্মসমূহকে জীবন দান কর। আমরা তোমার সামনে মিস্‌কীনের ন্যায় অবনত সুতরাং তুমি ক্ষমা কর। হে খোদা তোমার তরে আমার জান কুরবান, তুমি আমার বেহেশ্‌ত, আমি এমন কোন বেহেশ্‌ত দেখি নি যা তোমার ন্যায় এমন ফল দেয়। হে খোদা তোমার দাবীর জন্য আমরা স্বীয় জাতির মসলিসগুলো থেকে পরিত্যক্ত হয়েছি সুতরাং তুমি আমাদের একান্ত বন্ধু, যাকে সবার উপর অবলম্বন করা হয়েছে। হে আমার খোদা ! তোমার দাবীতে উৎসর্গীত স্বীয় বান্দাদের খেয়াল কর, তুমি ব্যতীত আমাদের কোন আশ্রয়স্থল এবং ঠিকানা নেই। হে আমার খোদা ! তুমি আমাকে কার দ্বারে, পরিত্যাগ করবে ? আমি যার নিকট নম্রতা প্রদর্শন করি সে কুবাক্য উচ্চারণ করে ? এবং আমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? আমরা সমস্ত পৃথিবীর নির্যাতন সহ্য করে নিয়েছি কিন্তু তোমার বিরহ আমরা সহ্য করতে পারব না।

আমার বন্ধু ! আস্ তুমি আমার স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম। তুমি আমার কোন পাপ দেখে থাকলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তোমার ফযলে আমরা শত্রুদের থেকে রক্ষা পেয়েছি কিন্তু তোমার কমনীয়তা আমাদেরকে ঘায়েল করেছে সুতরাং আস এবং পর্যবেক্ষণ কর। হে আমার খোদা ! আমার চিন্তা দূর করে দাও, হে আমার সাহায্যকারী শত্রুদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং মাটিতে মিশিয়ে দাও। আমরা তোমাকে না চাইতে দানকারী পেয়েছি সুতরাং এরপর আমাদের কোন চিন্তা নেই। আমরা সেই চোখে তোমাকে দেখেছি যা জ্যোতির্মন্ডিত করা হয়ে থাকে। হে আমার প্রিয় খোদা ! আমি তোমার প্রতাপ চাচ্ছি তবে স্বীয় বুযর্গী দ্বারা নয়। তুমি আমার হৃদয় এবং উদ্দেশ্যকে দেখছ। আমি যে সমস্ত পরিকল্পনা করি সেগুলোর প্রশংসা আমি তোমার নিকট চাচ্ছি না। আমি তো কেবল একটি "সারগীন" (তুচ্ছ বস্তু)-এর ন্যায় যা মাটিতে মিশানো হয়ে থাকে" (ইযাজে আহমদী)।

"সারগীন" এর অর্থ হচ্ছে গোবর যা মাটিতে মিলানো হয়ে থাকে, অত্যন্ত বিনীত বাক্য। হযরত দাউদ (আঃ)-এর যবুরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'আমিতো কেবল একটি 'সারগীন' এর ন্যায় যা মাটিতে মিশানো হয়ে থাকে।'

"আমার জাতি আমাকে কাফির আখ্যা দিয়েছে, তাই আমি নির্যাতিত হয়ে তোমার নিকট এসেছি, সেই ব্যক্তি কীভাবে কাফির আখ্যায়িত হতে পারে, যে মুহাম্মদ (সঃ)-কে ভালোবাসে ? আমি বাটালার দুষ্ট ধর্মীয় পন্ডিত এর ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত। সে অনেককে দুষ্টামির মাধ্যমে পথভ্রষ্ট এবং সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হে আমার খোদা ! এমন মিথ্যাবাদীকে পাকড়াও কর যেভাবে তুমি পাকড়াও কর সেই ব্যক্তিকে যে (তোমার) ওলীর সঙ্গে বিরোধিতা এবং কাঠিন্য প্রদর্শন করে। হে আমার প্রতিপালক ! আমার ধর্মীয় গুরুর উম্মতের অবস্থা সংশোধন কর এটি তোমার জন্য সহজ কিন্তু আমাদের জন্য কঠিন। তোমার সাহায্যের হাত ছাড়া কেউ উচ্চে উপবিষ্ট হতে পারে না। তোমার নিয়তি বা অমোঘ বিধানে নির্দিষ্টকৃত সেই পেয়ালা ছাড়া কেউ কাউকে কোন কিছু পান করাতে পারে না। বিপদাবলীর মাধ্যমে আমাদের অস্তিত্বকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে আর আমরা মারা গিয়েছি সুতরাং তুমি যে সকল ত্রুটি দেখছ সেগুলি বর্ণনা কোর না এবং আমাদের পরাস্ত করার জন্য তরবারী নিষ্কোষিত করো না। কৃপার দৃষ্টি দাও এবং ক্ষমা কর।

হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যদি আমাদের ত্রুটির জন্য আমাদেরকে বিধ্বস্ত কর তাহলে

আমরা লাঞ্ছনার মৃত্যুতে নিঃশেষ হয়ে যাব, অপর দিকে শত্রু গর্ব করবে। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ময়দান থেকে পিছপা হব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে সাহায্য না কর। আমার জন্য আবশ্যক, হয় আমি ধ্বংস হব, নয়ত আমি সফল হব। আমি দেখছি পাপ বৃহত্তর। সেই সঙ্গে আমি এ-ও জানি তোমার ফযল ও অনুগ্রহ সর্ববৃহৎ। হে আমার আল্লাহ্! আমাদের আকুতি-মিনতি গ্রহণ কর, আমাদেরকে পরিতৃপ্ত কর এবং তোমার অনেক বড় শক্তির মাধ্যমে আমাদের হিফাযত কর, নিঃসন্দেহে তুমি মহান শক্তি ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। আমরা সৃষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা কর্তিত হয়ে গিয়েছে তাই আমরা তোমার নিকট এসেছি। হে সেই সত্তা! যিনি সেই বিষয়কে জানেন যা হৃদয়ে গোপন করা হয়। তোমার মর্যাদা উচ্চ। হে সেই সত্তা যার পূর্ণতার পরিবেষ্টন সম্ভব নয়, তোমার প্রশংসা এমন প্রশংসা যা গণনা সম্ভব নয়। তুমি মর্যাদা অনুযায়ী– কৃপা প্রদর্শন করে থাক; তাই বড় শক্তির অধিকারী হিসাবে তুমি নিজের বান্দাদের সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক! প্রত্যেক রণাঙ্গণে আমার হাত ধর এবং এই অসহায় ও বন্ধু-বান্ধব হীনকে সাহায্য করো। অভিসম্পাতকারী এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। আমি নিঃস্ব ও ভিখারী হয়ে তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি তোমার সাহায্য সবচেয়ে বড়, আমি পিপাসার্ত হয়ে তোমার নিকট এসেছি আর তোমার সমুদ্র অনেক প্রাচুর্যপূর্ণ। মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মের চিহ্ন মুছে গিয়েছে সুতরাং আমি তোমাদের সমীপে মিনতি করছি, তুমিই নির্মাণ কর এবং আবাদ কর, হে ইসলামের সাহায্যকারী! হে আহমদ (সঃ)-এর প্রতিপালক! সাহায্যের সঙ্গে আমার আকুতি-মিনতিকে গ্রহণ কর, কেননা আমাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। হে সেই রসূল-এর প্রতিপালক! যাকে তুমি এমন উচ্চ সম্মান দিয়েছ যা দেখে সৃষ্টি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে। তুমি সব সময় কৃপালু এবং দয়া প্রদর্শনকারী, আমি কখনও বঞ্চিত থাকি নি সম্মানই পেয়েছি। তুমি আমাকে আমার বিরুদ্ধবাদীদের শিকার বানিও না। হে খোদা! তুমি আমার একান্ত আপন, প্রত্যেক ত্রুটিকে ক্ষমা করে থাক এবং তুমি তত্ত্বাবধায়ক। সকল সৃষ্টির তুমি আশ্রয়স্থল এবং তুমি সংরক্ষণকারী। তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং সম্মান দাও।

প্রতিপালকের দ্বার ব্যতিরেকে কেবল লাঞ্ছনা আর লাঞ্ছনা এবং প্রতিপালকের জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। নির্বোধ লোকেরা এর প্রকৃত বাস্তবতা থেকে অজ্ঞ।

তারা কেবল এতটুকু জানে যে, তিনি কথায় নম্র। এ সকল লোকের সৃষ্ট বিপদাবলী সাধারণ হয়ে গিয়েছে, তাদের ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের সীমালংঘনের কারণে বিপর্যয়ের বন্যা অনেক কঠিন রূপ ধারণ করেছে। হে খোদা! তুমি তাদেরকে সেইভাবে পাকড়াও কর যেভাবে তুমি এক সন্ত্রাসীকে পাকড়াও করে থাক। তাদের দীর্ঘ অবস্থান পৃথিবীকে নষ্ট করে দিয়েছে। হে সর্বশক্তিমান! তুমি স্বীয় কৃপায় পুরুষ এবং মহিলাদের ত্বরিৎ খবর নাও এবং সৃষ্টিকে এই ঝড় থেকে পরিত্রাণ দাও, তাদের সেনাদল এ মুসলমানদের হৃদয় পর্যন্ত এসে গেছে এবং তাদের সৃষ্ট বিপদাবলীতে মুসলমান মহিলারা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে। হে আহমদ (সঃ)-এর প্রতিপালক! হে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আল্লাহ্! তুমি স্বীয় বান্দাদের, তাদের সৃষ্ট বিষের ধূঁয়া থেকে রক্ষা কর।

হে আমাদের সাহায্যকারী ! তুমি ছাড়া আমাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। আমাদের উপর তাদের প্রাধান্য হয়ে গিয়েছে আর সাহায্যকারীদের তুমি সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। হে খোদা! প্রস্তরাঘাতে তাদের কাঁচগুলোকে ভেঙ্গে দাও এবং তাদের কথার বিষ থেকে স্বীয় বান্দাদের রক্ষা কর, শত্রুতার বশে তারা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার সেই নবীকে গালি দিয়েছে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং তুমি তাদের অন্যায়কে দেখ। হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে সেইভাবে নিষ্পেষিত করে থাক এবং তাদের অট্টালিকাসমূহকে বিধ্বস্ত করার জন্য তাদের ঘরের উঠোনে নেমে আস। হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের টুকরো টুকরো কর এবং তাদের জনবলকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কর। হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে তাদের নম্র-ভদ্র হওয়ার দিকে টেনে নিয়ে আস। তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করা এবং কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করার দৃঢ় সংকল্প নিজেদের অন্তরে এঁটেছে। সুতরাং তুমি তাদের ষড়যন্ত্র তাদের নিজেদের দিকেই নিক্ষেপ কর। তারা মনে করেছে। খোদাতাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবেন না। তাই তারা খোদাতাআলার পৃথিবীতে সীমালংঘন করে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছে। আমি আমার প্রতিদ্বন্দিতার সময় স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছি। তাদের বর্শা থেকে বাঁচার জন্য খোদাতাআলা আমার রক্ষা-কবচ। হে আমার সাহায্যকারী! তুমি ভিন্ন আমার কোন ভরসাস্থল নেই সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তাদের পাহাড়সমূহকে বিধ্বস্ত করার জন্য আমাদের সাহায্য কর।

হে আমার প্রতিপালক ! ক্রুশের ধ্বংস আমাকে দেখাও, হে আমার প্রতিপালক ! তাদের সীমানায় আমাকে শাসনকর্তা নিয়োগ কর। হে আমার প্রতিপালক ! তোমার প্রত্যেক দিনই অদ্ভুত মর্যাদাপূর্ণ। তুমি স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে সাহায্য কর।"

"তুমি স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে সাহায্য কর"। –এ দোয়াটি অদ্ভুত শানের সঙ্গে পূর্ণ হচ্ছে। খ্রীস্টানদের কর্মক্ষেত্রের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের সাহায্য করে যাচ্ছেন।

"আমরা মিনতির সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে কান্নাকাটিকে বাধ্যতামূলকভাবে অবলম্বন করছি এবং আমরা তাদের বাহনের বিপরীতে খোদাতাআলার আশ্রয় চাচ্ছি। খোদাতাআলার বর্শা এমন, যা নিক্ষিপ্ত হলে লক্ষ্যচ্যুত হয় না এবং খোদাতাআলার ক্রোধ তাদের ক্রোধের উপর বিজয়ী। হে সর্বশক্তিমান ! আমাদের জন্য স্বীয় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ কর। কেননা, আমরা তাদের সাক্ষাতে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক ! প্রাণ বায়ু অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছে। হে আমাদের প্রতিপালক ! সৃষ্টিকে তাদের সর্প থেকে পরিত্রাণ দাও; হৃদয় ব্যাকুলতায় টকুরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। দয়া কর এবং আমাদের আত্মাগুলোকে তাদের কাল্পনিক দানব থেকে মুক্তি দাও। শত্রুদেরকে নেকড়ে বাঘের ভোক্ষ্য ছাগলের ন্যায় বানিয়ে দাও যেন সেগুলি তাদেরকে আঁচড়ে আঁচড়ে খায় এবং আমাদের হৃদয়গুলিকে তাদের লাঞ্ছনা এবং অপমানের মাধ্যমে আরোগ্য দান কর" (নূরুল হক, ১ম খন্ড)।

অতঃপর অন্যত্র বলেন, "আমি এ কাসীদাহ্ [মুহাম্মদ (সঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনায় লেখা কবিতা] ব্যস্ততার মাঝে রচনা করেছি এই কাসীদাহ্ মণি-মানিক্যের ন্যায় অথবা সেই স্বর্ণের ন্যায় যা ছোট মাটির পাত্র (যাতে স্বর্ণ পাকা করা হয়) থেকে বের করা অর্থাৎ পুড়িয়ে খাঁটি করা হয়। আমি এটি স্বীয় সামর্থ্যের দ্বারা লিখি নি বরং সেই মণি-মানিক্য খোদাতাআলা কর্তৃক প্রদত্ত যা আমার হাত দ্বারা গাঁথা হয়েছে। হে খোদা ! মুহাম্মদ (সঃ)-এর সম্মান রক্ষার্থে বরকত দাও। যিনি সকল দয়ালু থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল পুণ্যবানদের থেকেও পুণ্যবান" (নূরুল হক- ২য় খন্ড)।

অতঃপর লিখেন, "নিশ্চিত সকল সাহাবাই সূর্য-তুল্য। তাঁরা স্বীয় জ্যোতিতে সৃষ্টির চেহারাকে

জ্যোতির্ময় করেছেন। তাঁরা স্বীয় আত্মীয়-স্বজন এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনদের ভালোবাসাকে ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র রসূলের সমীপে দরবেশের ন্যায় উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি রসূল (সঃ)-এর সাহাবাদেরকে খোদার সমীপে স্থায়ী সম্মানের জায়গায় দেখছি তাঁরা সুখে-দুঃখে রসূল (সঃ)-এর অনুবর্তিতা করেছিলেন এবং স্বীয় প্রেমাস্পদ-এর রাস্তায় নিজেদেরকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। তুমি তাঁদের খেদমত এবং দৃঢ়চিত্ততাকে দেখ আর শত্রুদেরকে স্বীয় ক্রোধ এবং হিংসায় বাড়তে দাও। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উপরেও নবী আকরম (সঃ)-এর সাহাবাদের বদৌলতে কৃপা কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমিই নেয়ামতের অধিকারী আল্লাহ্। নির্দিধায় যে নবী করীম (সঃ)-এর সাহাবাদের গালি দেয় সে ধ্বংস প্রাপ্ত এবং এটি একটি ধ্রুব সত্য। এ শব্দে কোন গোপনীয়তা নেই" (সিররুল খেলাফা)।

অতঃপর তিনি (আঃ) অন্যত্র লিখেন, "আমাদের শরীয়ত একটি আশ্চর্যজনক ভূমি। অথচ সেই বছরগুলোতে তাদের (মুখালেফদের) পক্ষ থেকে এমন নগ্নতা প্রকাশ পেয়েছিল যা লোমবিহীন এবং মেটে রং এর মত চক্ষু সেই অট্টালিকার ধ্বংসাবলীতে ক্রন্দন করছে। হে আমার প্রতিপালক ! এখন তুমিই সেই অনাবাদিকে আবাদ কর" (নূরুল হক - ২য় খন্ড)।

এগুলো আরবী ছন্দে গ্রথিত কাব্য ছিল এখন ফার্সী ছন্দে গ্রথিত কতক অনুবাদ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

"হে পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা! আমার জন্য রহমতের দ্বার খুলে দাও, তুমি আমার সেই ব্যথাকে জান যা আমি অন্যদের থেকে গোপন করছি। হে আমার প্রেমাস্পদ তুমি অত্যধিক সূক্ষ্মতি-সূক্ষ্ম তোমাকে যখন আমি নিজের ভিতর পাই তখন তুমিই আমার প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ কর , তাই (আমি তোমাকে) স্বীয় হৃদয়ের বাগিচা থেকে অধিক আনন্দিত করে দিব। হে পবিত্র গুণাবলীসম্পন্ন সত্তা যদি তুমি অস্বীকার কর তবে তোমার বিরহে আমি প্রাণ বিসর্জন দিব। এত ক্রন্দন করব যে, আমি এক জগতকে কাঁদাব। তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও অথবা মেহেরবানী করে স্বীয় দৃষ্টি আমার দিকে ফেরাও অথবা আমাকে মেরে ফেল বা মুক্ত করে দাও। কোন অবস্থায়ই আমি তোমার আঁচল ছাড়ব না।

বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, টিকার পাদটীকার পৃষ্ঠা ৩১৬)

"হে আমার প্রিয় খোদা! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার দরগাহের দিকে আমাকে রাস্তা প্রদর্শন কর। আমার আত্মা এবং হৃদয়ে জ্যোতির্মন্ডিত কর। আমার গোপন পাপ থেকে আমাকে পবিত্র কর, আমার হৃদয়ে বাস কর এবং মনে সন্তুষ্টির কারণ কর স্বীয় দয়ার দৃষ্টিতে আমার কাঠিন্য দূর কর, উভয় জগতে তুমিই আমার প্রিয় যে বিষয় আমি তোমার থেকে চাচ্ছি তা-ও তুমিই "। যে ফার্সী কবিতার পংক্তির অনুবাদ করা হ'ল তা হচ্ছে, দার দো আলম মেরা আযীয তোঈ ওয়াঁ কেহ্ মী যোয়াহাম আয় তো নীয তৌঈ (পরিশিষ্ট বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম অংশ পৃঃ ৪-৭, মুদ্রণ ১৮৮০ সন)

অন্যত্র লেখেন, "হে খোদা ! হে আমাদের দুঃখের ঔষধ নহে আমাদের কান্নাকাটির চিকিৎসা তুমি আমাদের আহত হৃদয়ে মলম দানকারী, তুমি আমাদের ব্যথিত হৃদয়ের মনস্তুষ্টিকারী! তুমি স্বীয় মেহেরবানীতে আমাদের সমস্ত বোঝা উঠিয়ে নিয়েছ এবং আমাদের বৃক্ষ তোমারই ফযলে ফলে-ফুলে সুশোভিত। তুমিই স্বীয় উদারতা এবং দয়ায় আমাদের হেফাযতকারী এবং আবরণে আবৃতকারী। স্বীয় পূর্ণাঙ্গীণ দয়ার মাধ্যমে অসহায়দের সাহায্যকারী। সুতরাং বান্দা যখন দুঃখগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত হয় তখন তুমিই তাৎক্ষণিক সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও। কোন অসহায়কে রাস্তায় অন্ধকার আচ্ছাদিত করে তখন তুমি তাৎক্ষণিক তার জন্য সহসা সূর্য এবং চাঁদ সৃষ্টি করে ফেল। সৌন্দর্য, চরিত্র এবং সাহস তোমাতে শেষ। তোমার সাক্ষাতের পর অন্য কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হারাম। হে খোদা! দুষ্ট লোকদের শিকড় অর্থাৎ মূলোৎপাটন করে দাও। যারা অন্যায়ভাবে সত্যচ্যুত হয়। তারা হৃদয়, চোখ এবং কান কিছুরই অধিকারী নয়। সে-ও ঐ পূর্ণাঙ্গীণ চাঁদের বিদ্রোহী। হে সেই ব্যক্তি যে নির্বুদ্ধিতার কারণে কঠিন অস্বীকারকারী এবং শত্রু, তুমি কেন বোকামী প্রদর্শন করছ, যাও আর খোদার দরজা কড়া নাড় এবং ফরিয়াদ কর, হে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ! আমার পায়ের ভারী শিকল খুলে দাও" (বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড টীকা, পৃঃ ৫২৪-৫৪২, মুদ্রণ - ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে)

অতঃপর তিনি (আঃ) খোদার সমীপে নিবেদন করেন, "হে খোদা ! প্রত্যেক দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রশান্তি সৃষ্টিকারী। হে অসহায়দের আশ্রয়স্থল এবং হে পাপীদের ক্ষমাকারী। কৃপা করে স্বীয় এই বান্দাকে ক্ষমা কর এবং এই পৃথক বসবাসকারীদের উপর করুণার দৃষ্টি দাও" (ফত্‌হে ইসলাম পৃষ্ঠা ৬৭, মুদ্রণ ১৮৯১)।

অতঃপর নিবেদন করেন, "হে আমার দয়াময় বন্ধু ! তোমার তরে আমার প্রাণ উৎসর্গীত। তুমি আমার সঙ্গে এমন কি পার্থক্য রেখেছে যে, আমি তোমার সঙ্গে পার্থক্য করব ? প্রত্যেক ভরসা ও বাসনা যা আমি অদৃশ্য থেকে চেয়েছি এবং প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা যা আমার হৃদয়ে ছিল তুমি স্বীয় করুণায় সে আকাঙ্ক্ষাসমূহ বাস্তবায়ন করেছ। করুণা করে তুমি আমার ঘরে আগমন করেছ। আমি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না তুমিই নিজেই এ সম্পদ আমার আঁচলে গেঁথে দিয়েছে। হে প্রতিপালক ! প্রত্যেক পদক্ষেপে আমাকে দৃঢ়তা দান কর এবং এমন কোন দিন যেন না আসে যে, আমি তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি। তোমার গলিতে যদি প্রেমিকদের মস্তক কর্তন হয় তাহলে সর্বপ্রথম যে প্রেমিকের দাবী করবে সে হবো আমি" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, শেষ পৃষ্ঠা, মুদ্রণ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

"হে খোদা আমার আত্মা তোমার গোপন রহস্যের নিকট উৎসর্গীত, তুমিই নিরক্ষরকে বুঝার শক্তি এবং কণ্ঠ দিয়েছ। তোমার এ পৃথিবীতে আমার ন্যায় উম্মী কোথায় ! আমার লালন-পালনই তো অজ্ঞতাসমূহের মাঝে হয়েছে। আমি একটি কীট ছিলাম তুমি আমাকে মানুষ বানিয়েছ। আমার অবস্থা তো বিনা পিতায় জন্মগ্রহণকারী মসীহ্‌র চেয়েও বেশী আশ্চর্যজনক"(ইযালায়ে আওহাম, ১ম অংশ, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৪)।

অতঃপর বলেন, 'প্রিয়! কৃপায় আমার পা জান্নাতে প্রবেশ করেছে এবং সেই বন্ধুর দয়ায় আমার হাতে সাক্ষাতের পেয়ালা (এসে গিয়েছে)। আমার দোয়াতে কুলিয়তের যে, উদ্দীপনা প্রকাশিত হয় সেই পরিমাণ উদ্দীপনা আমার মা-ও আমার কান্নাকাটিতে কবুল করেন নি। আমি প্রত্যেক দিক এবং পার্শ্ব থেকে সেই বন্ধুর চেহারা অবলোকন করি,তা সত্ত্বেও আর কে আছে যে, আমার দৃষ্টি গোচরে আসতে পারে। পরিতাপ! স্নেহাস্পদরা আমাকে চেনে নি, তারা আমাকে তখন চিনবে যখন আমি এই পৃথিবী থেকে চলে যাব।

প্রতি রাতে জাতির চিন্তায় হাজার রকমের কষ্টে আমি নিপতিত হয়ে থাকি। হে প্রতিপালক! আমাকে এই বিপর্যয় ও ফেতনা-ফাসাদের যুগ থেকে পরিত্রাণ দাও। হে প্রতিপালক! আমার চোখের পানি দিয়ে তাদের দুর্বলতা ধুয়ে দাও।

তুমি আমার ফরিয়াদ শ্রবণ কর, কেননা তুমি ব্যতিরেকে আমার অবশিষ্ট কেউ নেই, হে আমার প্রতিপালক! আমার কান্নাকাটি দেখে দয়া এবং কৃপার একটি দৃষ্টি দাও তোমার রহমতের হাত ছাড়া আর কে সাহায্যকারী আছে, আমার আত্মা মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মের রাস্তায় বিলীন হোক, এটি আমার হৃদয়ের কামনা, হায় যদি সুযোগ আসত!"(ইযলায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৮৫)।

উম্মতের হেদায়াতের জন্য দোয়া ঃ

"হে খোদা! হে হেদায়াতের জ্যোতির ঝর্ণা! দয়া করে এ উম্মতের চোখ খুলে দাও। হে আবেদনকারী! তুমি এই গোপন রহস্যের দিকে একবার মনোনিবেশ কর, এত করে তুমি যেন সন্দেহ এবং বিদ্বেষ থেকে মুক্তি লাভ কর।" এখানে 'তালেব', এর অর্থ হচ্ছে খোদার অন্বেষণকারী, সম্বোধন করে বলছেন। 'হে আবেদনকারী! তুমি এই গোপন রহস্যের দিকে একবার মনোনিবেশ কর, যেন তুমি সন্দেহ এবং বিদ্বেষ থেকে মুক্তি পাও' (রাযে হকীকত, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খন্ড, পৃঃ ১৫১)।

অতঃপর সিদ্ধান্তকারী নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য এক দোয়া। "হে খোদা! পৃথিবী ও আকাশের মালিক, হে প্রত্যেক বিপদে স্বীয় জমাতকে পৃষ্ঠপোষকতাকারী, হে বার বার কৃপাকারী, সাহায্যকারী এবং পথ প্রদর্শনকারী! পৃথিবীতে কঠিন গন্ডগোল ছেয়ে আছে, নিজের সৃষ্টির প্রতি কৃপা কর। স্বীয় দরবার থেকে কোন সিদ্ধান্তকারী বিষয় প্রকাশ কর যেন ঝগড়া এবং ফাসাদ বন্ধ হয়ে যায়" (আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩২১)।

অতঃপর এই দোয়া যে, "হে খোদা! তোমার পক্ষ থেকে কখন সাহায্যের সময় আসবে, আমরা কখন সে শুভ দিন এবং বছর দেখব। আহমদের ধর্মের দু'টি চিন্তা আমার অস্তিত্ব টলিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ধর্মের শত্রুদের আধিক্য এবং ধর্মের সাহায্যকারীদের স্বল্পতা। হে খোদা তাড়াতাড়ি আস এবং আমাদের উপর সাহায্যের বারি বর্ষণ কর নতুবা হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এই অগ্নিময় স্থান থেকে উঠিয়ে নাও। হে খোদা মুহাম্মদের (সঃ) সংবাদ দিয়ে হেদায়াতের জ্যোতিঃ প্রকাশ কর এবং আলোকিত নিদর্শন প্রদর্শন করে পথভ্রষ্টদের চক্ষু আলোকিত কর। তুমি যখন আমাকে এই মর্মপীড়ায় দৃঢ়তা দান করেছ তখন আমি আশা করি যে, তুমি এ ব্যাপারে আমাকে বিফলতার সাথে মৃত্যু দিবে" (ফত্হে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৬)।

অন্যত্র বলেন, "সেই বন্ধু আমার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেন, হে মৃত তুমি কি কখনও এমন আর কাউকে প্রদর্শন করতে দেখেছ। তুমি খোদার রহস্য জান না, তোমার সমস্ত ভিত্তি সন্দেহ এবং বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেঁদে কেঁদে রাস্তা খোঁজ যেন খোদার কৃপা উদ্দীপ্ত হয়। স্বীয় অশ্রু দ্বারা নিজের বিছানাগুলিকে ভিজাও অতঃপর আঘাতপ্রাপ্ত হৃদয়ে এভাবে নিবেদন কর, হে সর্বজ্ঞ খোদা! তুমিই গোপন রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তোমার জ্ঞান পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি কীভাবে পৌঁছাতে পারে। এ ব্যক্তি আমাদেরকে যে রাস্তার দিকে আহ্বান করছে তা যদি তোমার রাস্তা থেকে হয়ে থাকে তাহলে তুমিই এর প্রকৃত অবস্থাকে ভালো জানো। তাই তুমিই আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদের চক্ষু উন্মোচন কর যেন আমরা বিরোধিতা এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মৃত্যু বরণ না করি। তুমিই আমাদের এ পরীক্ষায় সফল কর কেননা, তুমি বার বার কৃপাকারী, সর্বশক্তিমান এবং ক্ষমাশীল"(নযূলুল্ মসীহ্, পৃষ্ঠা ৯৭-১০৭, মুদ্রণ-১৯০৯)।

পরের দোয়াটি হচ্ছে, "এ বিপদের সময় আমাদের নিকট গরীবদের চিকিৎসা কেবল প্রাতঃকালের দোয়া এবং প্রভাতের কান্না ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই। হে খোদা এই কালো হৃদয়ের অধিকারী যার (হৃদয়ে) তোমার মনোনীত আহমদের ধর্মের চিন্তা নেই, তুমি তাকে কখনো খুশি ক'র না।" (বারাকাতুদ্ দোয়া, পৃষ্ঠা-৩২, মুদ্রণ, ১৮৯৩)

অন্যত্র খোদার সমীপে নিবেদন করেন, "হে সেই সত্তা যাতে আমার মাথা, হৃদয়, অন্তর এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিবেদিত। স্বীয় রহমতে আমার হৃদয়ে তোমার তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বার খুলে দাও। দার্শনিকরাতো উন্মাদ তারা তোমাকে জ্ঞানের জোরে খুঁজতে চায়। তোমার গোপন রহস্য জ্ঞানের অনেক উর্ধ্বে। তুমিই স্বীয় প্রেমিকদের উভয় জগৎ দান করে থাক কিন্তু তোমার দাসদের দৃষ্টিতে উভয় জগতই তুচ্ছ। কৃপার দৃষ্টি দাও যেন লড়াই-ঝগড়া শেষ হয়। সৃষ্টি তো তোমার দলিল-প্রমাণের ভিখারী। ভূমিকম্পের দর্শনে কৃপার ঝর্ণা প্রবাহিত কর। তোমার এই আকুতি মিনতীকারী দাস কতক্ষণ দুঃখের আগুনে জ্বলতে থাকবে" (চশমায়ে মসীহী; শেষের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা)।

অতঃপর পরিসমাপ্তি কল্যাণকর হওয়ার জন্য দোয়া, "খোদা যদি বান্দার উপর সন্তুষ্ট না হন তাহলে (আমার ন্যায়) এমন প্রাণিও ধিকৃত। আমরা যদি স্বীয় নোংরা সত্তার লালন-পালনে নিয়োজিত থাকি তাহলে আমরা পথের কুকুর-এর চাইতেও নিকৃষ্ট। হে খোদা ! হে হেদায়াত প্রত্যাশীদের পথ প্রদর্শনকারী ! হে সেই সত্তা যাঁর ভালোবাসা আমাদের আত্মার জীবন-স্বরূপ আমাদের সমাপ্তি তোমার সন্তুষ্টির উপরে কর যেন উভয় জগতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় (আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৩৪)।

অতঃপর অন্য এক জায়গায় লেখেন, "আমরা সকল পয়গম্বরের দাস এবং মাটির ন্যায় তাদের দ্বারে পড়ে আছি। সেই সব রসূল যারা খোদার পথ প্রদর্শন করেছেন, আমাদের আত্মা সেই পুণ্যবানদের তরে উৎসর্গীত। হে আমার খোদা ! এই সব নবী, যাদেরকে তুমি বড় আশীষ সহ পাঠিয়েছ তাঁদের বদৌলতে তুমি আমাকে যেমন হৃদয় দিয়েছ তেমন তত্ত্ব-জ্ঞানও দান কর। তুমি যখন আমাকে পেয়ালা দান করেছ তখন পানীয়ও দান কর। হে আমার খোদা ! প্রত্যেক ক্ষেত্রে তুমি যাঁর সাহায্যকারী ছিলে সেই মুস্তাফা (সঃ)-এর নামে দয়া ও কৃপা করে আমার হাত ধর এবং আমার কাজে বন্ধু ও সাহায্যকারী হও। যদিও আমি মাটির ন্যায় বরং এর চেয়েও নিম্নতর তথাপি আমি তোমার শক্তির উপর ভরসা করছি" (পরিশিষ্ট, বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম অংশ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩)।

অন্যত্র এই দোয়া রয়েছে রয়েছে যে, "মুহাম্মদ (সঃ)-এর ভালোবাসায় আমার অন্তর এবং সত্তা উৎসর্গীত হোক। এটি আমার আকাঙ্ক্ষা দোয়া এবং আত্মিক সংকল্প" (তৌযীহে মারাম, পৃঃ ২৩, মুদ্রণ ১৮৯১)।

হে দয়ালু খোদা ! ধর্মের সাহায্যকারী ব্যক্তির প্রতি সহস্র কৃপা, কখনো যদি বিপদ আসে তাহলে তার বিপদকে দুরীভূত করে দাও। হে সর্বশক্তিমান খোদা, তাকে এমন আনন্দে রাখ যেন তার প্রত্যেক অবস্থা এবং কাজে একটি জান্নাত সৃষ্টি হয়ে যায়"(প্রচ্ছদ, আইনায়ে কামালতে ইসলাম, মুদ্রণ-১৮৯৩)।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব-এর স্মরণে লেখেন, "আব্দুল করীম যে কি বীরত্বের সাথে সিরাতুল মুস্তাকীমে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন দিয়েছে তার গুণাবলী কীভাবে গণনা করা অসম্ভব। সে ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী ছিল। খোদা তার নাম 'লিডার' (নেতা) রেখেছিলেন, সে খোদার রহস্যের তত্ত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ছিল এবং মজবুত ধর্মের সম্পদ ছিল। যদিও এমন একান্ত বন্ধুর বিরহে

হৃদয় ব্যথিত তথাপি আমরা দয়ালু খোদার কাজে সন্তুষ্ট, হে খোদা তুমি তার কবরে করুণার বারীবর্ষণ কর এবং অত্যধিক অনুগ্রহের সঙ্গে তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট কর। উপরন্তু আমাদেরকে যুগের বিপদাবলী থেকে রক্ষা কর। হে সর্বশক্তিমান এবং বারবার কৃপাকারী খোদা ! তুমিই আমাদের ভরসা" (আখবার বদর, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ইং)

তারপর অন্যত্র লেখেন, "হৃদয় সব সময় চিন্তায় অস্থির থাকে যে, আল্লাহ্‌তালা আমাদের জামাতকেও সাহাবা (রাঃ)-এর পুরস্কারে ঐশ্বর্যশালী করুন। তাদের মধ্যে সেই সততা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আনুগত্য সৃষ্টি হোক যা সাহাবা (রাঃ)-এর ছিল। তারা যেন খোদা ব্যতিরেকে অন্য কাউকে ভয় না করে। মুত্তাকী হোক, কেননা খোদার ভালোবাসা মুত্তাকীদের সাথেই হয়ে থাকে, 'ইন্নাল্লাহা মাআল্ মুত্তাকীন' অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন" (আল্ হাকাম, ৪র্থ খন্ড, ৪৬ নং পৃঃ ১-৪, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯০০ইং)।

সব শেষে কিশতিয়ে নূহ্ থেকে একটি উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে যাতে তিনি (আঃ) জামাতকে সম্বোধন করে বলেন, "তোমরা এমন আদর্শ প্রদর্শন কর যেন আকাশ থেকে ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের আন্তরিকতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় এবং তোমাদের প্রতি আশীষ প্রেরণ করে। তোমরা একটি মৃত্যুকে অবলম্বন কর যেন তোমাদেরকে জীবন দান করা হয় এবং তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে নিজেদের অভ্যন্তরকে মুক্ত রাখ যেন খোদা তাতে অবতীর্ণ হন। একদিকে পরিপূর্ণভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ কর এবং অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গীণভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি কর। খোদা তোমাদের সাহায্য করুন। এখন আমি শেষ করছি এবং দোয়া করছি, আমার এ শিক্ষা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হোক। তোমাদের ভিতরে এমন পরিবর্তন সাধিত হোক যেন তোমরা পৃথিবীর তারকাতে পরিণত হও এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালক থেকে যে জ্যোতিঃ লাভ করেছ পৃথিবী সেই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়, আমীন, সুম্মা আমীন।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, পৃঃ ৮৫)।

[*'আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল'-এর ২২-২৮ সেপ্টম্বর, ২০০০ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে*]

অনুবাদ ঃ মাওলানা বশীরুর রহমান
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মি'রাজ

"যারা ইহ জগতে অন্ধ পরজগতেও তারা অন্ধ থাকবে" (সূরা বনী ইসরাঈল)। কুরআন করীমের উপরোক্ত আয়াতের মমার্থ ইহা নয় যে, যারা মাত উদর থেকে চক্ষুহীন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবে তারাই পরজগতে অন্ধ থাকবে বরং ঈমানহীনতার কারণে যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শূন্য, কুরআন হাদীস পাঠ করে, অথচ তা তাদের গলার নীচে প্রবেশ লাভ করে না, একটু হৃদয়ঙ্গম করে দেখে না যে, এই কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলার কী আদেশ ছিল এবং আমরা কী কাজ করছি, বিশ্বাস ও কর্মে ছবি ছুরতে লম্বা চওড়া পোষাক-পরিচ্ছদে সেজে বাহ্যিক লোক দেখানো কার্যকেই ধর্ম বলে গণ্য করে, ঈমান বলতে শুধু বাহ্যিকভাবে মুখোচ্চারিত শব্দের স্বীকারোক্তিকেই মনে করে, প্রকৃত নেক কাজে সম্পূর্ণ উদাসীন, বিশ্বাস ও কর্মে অভিনব ও অমূলক কেচ্ছা-কাহিনী শিক্ষা দেয় – এদেরকে কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা অন্ধ, বোবা, বধির এবং মৃত বলে অভিহিত করেছেন। এরূপ অবস্থায় দয়াময় আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার প্রতি করুণার নিদর্শনরূপে মানুষেরই মধ্য হতে মানুষেরই কল্যাণের নিমিত্ত কোন একজন প্রেরিত মহাপুরুষকে আবির্ভূত করেন। যিনি এসে অন্ধকে দৃষ্টি-শক্তি দিয়ে, বোবার মুখে বাণী ফুটিয়ে, বধির জনকে শ্রবণেন্দ্রিয় দানে মৃত দেহে পুনঃ নতুন প্রাণের সঞ্চার করতঃ জীবন্ত করে তুলেন। তাই পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি মৃত ছিল তৎপর আমি তাকে জীবিত করলাম এবং তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করে দিলাম, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে বিচরণ করতে পারে, সে কি তার ন্যায় হতে পারে যে অন্ধকাররাশির মধ্যে পড়ে আছে, যা থেকে সে বের হতে পারে না" ? (সূরাতুল আনআম)।

বর্তমানে আমরা যে যুগে বাস করছি, ইহা এইরূপ এক অন্ধকারময় যুগ যে, বিশ্বাস ও কাজ-কর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিকার উপস্থিত হয়েছে। পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার প্রচন্ড তুফান প্রবাহিত হচ্ছে। ঈমানদারীর ভান্ডার শূন্য। এই অবস্থায় জ্ঞানান্ধ নিমজ্জিত মানব জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত এ যুগেও আল্লাহ্‌তাআলা তার করুণার নিদর্শনরূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তাঁর সংস্পর্শে অন্ধ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়, বধির জনে পায় শ্রবণ শক্তি, খোঁড়া লোক পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করতে সমর্থ হয়। বোবার মুখে বাণী নির্গত হয়ে মৃত দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতঃ জীবন্ত হয়ে উঠে।

কুরআন ও বিজ্ঞান কারো সাথে কারো শত্রুতা নেই। বরং একে অন্যের পরিপূরক। দুইয়ে মিলে পূর্ণতা। একটু গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে দেখলে অতি সহজেই বোধগম্য হয় যে, বিজ্ঞানের উৎস-স্থল পবিত্র কুরআন। বিজ্ঞান নিজে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আবিষ্কার করে মাত্র। ইথার, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ইত্যাদি আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টি রহস্যাবলীকে নিয়ে তাদের আরামের সুখকে হারাম করে দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে গভীর চিন্তা গবেষণা দ্বারা এগুলি আবিষ্কার করতঃ মানুষের কল্যাণে শিল্পে সাহিত্যে ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেছে। "বল কে কি সৃষ্টি করেছে, ইহা তো আল্লাহ্‌তাআলারই সৃষ্টি"। পবিত্র কুরআন করীমে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ-তত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় স্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টি সম্বন্ধে এক প্রহর চিন্তা করে, সে সারা বছরের ইবাদত করে"। প্রশ্ন আসে এই যে, প্রকৃত ইবাদতকারী কারা, ইহুদী খ্রষ্টানগণ, অথবা মুসলমান মাওলানা মুফতী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদের দাবীদার- গণ ? কুরআন করীমের এক একটি আয়াতকে নিয়ে গভীর গবেষণা করে আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টির এক একটি বস্তু আবিষ্কার করতঃ আজ ইহুদী খৃষ্টানগণ জগতের বুকে সম্মানের অধিকারী হয়ে আছে। অসার, মুসলমান আলেম ওলামা মুফতী মাওলানা খেতাবধারী নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ মনগড়া আর আজগুবি গল্প-গুজব কল্পিত কেচ্ছা-কাহিনীতে মশগুল হয়ে ঘুমের ঘোরে অচেতন অবস্থায় বেহেশতের হুরীপরী গেলমানের রূপে মত্ত হয়ে দিন গুনছে, কবে নাগাত তাদের পরশ পাবেন। তাদের কথা কাজ আচার-আচরণে বক্তৃতা বিবৃত্তিতে মনে হয় বেহেশ্‌তটা আল্লাহ্‌তাআলা যেন একচেটিয়া তাদের জন্যই তৈরী করে রেখেছেন।

তাই তো তারা কুফরী ফতুয়ার তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে নিয়ে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় ইত্যাদি কাট ছাট করার কাজে ব্যস্ত। কুরআন করীমের আয়াতকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে দেখার সময় কখন ?!

যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীত বিজ্ঞান অবাস্তব কোন বিষয়কে মেনে নেয় না। তেমনি পাক কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, "ধ্বংস সেই ব্যক্তি হয়, যে যুক্তি-প্রমাণে পরাজিত হয়, এবং যে দলিল-প্রমাণে জীবিত, সে-ই জীবিত থাকে" (সূরাতুল আনফাল)। প্রমাণিত হলো যে, কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বিজ্ঞান অথ এক কথায় বিশিষ্ট জ্ঞান। কুরআনকে বুঝতে হলে জ্ঞানের আবশ্যক। তাই ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল করীম (সঃ) জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য অত্যাবশ্যক করে বলেছেন, "জ্ঞান আহরণ কর যদিও সুদূর চীন দেশে যেতে হয়।" সেই জ্ঞান শুধু মক্তব মাদ্রাসার পুঁথিগত বিদ্যায় যেন-তেনভাবে আলেম, ফাযেল, মাওলানা মুফতী খেতাব লাভ করার নাম নয়। আল্লাহ্র কুরআনকে বুঝতে হ'লে ঐশরিক জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়া অত্যাবশ্যক। তাই দয়াময় আল্লাহ্তাআলা তার বান্দাগণকে প্রকৃত জ্ঞানে জ্ঞানবান করার নিমিত্তে যুগে যুগে প্রেরিত মহাপুরুষদেরকে আবির্ভূত করেন।

বিগত অক্টোবর ২০০০ "মাসিক কাবার পথে" নামক পত্রিকায় "কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মি'রাজ" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হলো। প্রবন্ধটির নামকরণ যদিও 'কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে মি'রাজ' রাখা হয়েছে কিন্তু সারাটা প্রবন্ধে কুরআন ও বিজ্ঞানের কোন যুক্তি-প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। উক্ত প্রবন্ধের সার কথায় ইহাই বুঝা যায় যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন আল্লাহ্তাআলার পিয়ারা নবী। সুতরাং যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই সকলেই কেন হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর সশরীরে মি'রাজ গমনকে বিশ্বাস করে নেয় না। কেননা, আল্লাহ্তালা তো সব কিছুই করতে পারেন।

হ্যাঁ, আল্লাহ্তালা সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। তিনি কোন কোন মানুষকে শিং ও লেজ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বিধান বহির্ভূত কোন কাজ করেন না। "আসমান জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তৎসমুদয় তাঁরই একটি বিধানানুযায়ী চলছে।"

"তাঁর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই" (সূরা বনী ইসরাঈল)। যেমন, সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। ইহা কখনও পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়ে পূর্ব দিকে অস্ত যাবে না। আম গাছে কখনও জাম ধরবে না, জাম গাছে কখনও আম ধরবে না। তেমনিভাবে তেঁতুল গাছে কখনও কাঁঠাল ধরবে না, কাঁঠাল গাছেও তেঁতুল ফলবে না। ইহা আল্লাহ্তাআলার অপরিবর্তনশীল বিধান।

উক্ত প্রবন্ধে কতকগুলি উদ্ভট কথার অবতারণা করা হয়েছে যা কিনা অমুসলিম চিন্তাবিদদের হাস্য রসের খোরাক জোগায় এবং ইসলাম বিদ্বেষী লেখকবৃন্দকে তাদের লেখায় রং তুলি দিয়ে সাহায্য করে। আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

লেখক উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন, "প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, 'বুরাক' (অত্যন্ত দ্রুতগামী একটি সওয়ারী যা খচ্চরের চেয়ে ছোট গাধা হতে একটু বড় ছিল, সাদাবর্ণ বিশিষ্ট। তার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায় উপস্থিত করা হয়। আমি 'বুরাকে' আরোহণ করে জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে (প্রথমে) বাইতুল মুকাদ্দস মসজিদে পৌছলাম। এ মসজিদেই আমার পূর্ববর্তী সমস্ত নবী- রসূলগণ (আঃ) আমার ইমামতীতে জামায়াত বদ্ধভাবে নামায আদায় করেন"।

প্রশ্ন আসে এই যে, জড় দেহ নিয়ে হযরত রসূল করীম (সঃ) 'বুরাক' নামক যে একটি জড় বস্তুর উপর সওয়ার হয়ে বায়তুল মুকাদ্দস মসজিদে পৌছলেন, যার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায় পৌছতো, সেই বস্তুটার স্বরূপ যে কী কুরআন ও বিজ্ঞানের আলোকে তার কোন প্রমাণ নেই। তারপর হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পূর্ববর্তী নবী রসূলগণ মারা গিয়ে সকলই বেহেশ্তবাসী হয়ে আছেন, তাঁরা কি আবার জড় দেহ ধারণ করে বেহেশ্ত থেকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে বায়তুল মুকাদ্দস মসজিদে সমবেত হয়ে জড়দেহদারী হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর ইমামতীতে জামাতবদ্ধভাবে নামায আদায় করেছিলেন ? কুরআন ও বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি প্রমাণ দেয় ?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "যে শহরকে (অধিবাসীগণ) আমরা বিনষ্ট করে দেই, ইহা আমরা হারাম করেছি যে, তারা (মৃতব্যক্তিগণ) পুনরায় ফিরে যায়, অর্থাৎ জীবিত হয়" (সূরা আম্বিয়া)। যারা বেহেশ্তে প্রবেশ লাভ করে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্তাআলা বলেন, "এবং তাদেরকে বেহেশতের (অধিবাসীগণকে) সেখান (বেহেশ্ত) থেকে বহিষ্কৃত করা হবে না" (সূরা হিজর)।

সেখানে (বেহেশ্তে) তারা চিরকাল থাকবে, তারা সেখান (বেহেশ্ত) থেকে বের হতে ইচ্ছা করবে না" (সূরা কাহাফ)। "এবং তোমরা আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না" (সূরাতুল ফাতির)। হযরত জাবের (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-যুদ্ধে যখন নিহত হলেন, তখন হযরত রসূল (সঃ) জানিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে আল্লাহ্তাআলার সমক্ষে যখন উপস্থিত করা হয়, তখন আল্লাহ্তাআলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কি চান। তদুত্তরে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেছিলেন যে, তিনি আবার দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার আল্লাহ্র পথে শহীদ হতে চান এবং বারবার এইরূপ জীবন লাভ করতে ও মরতে চান। আল্লাহ্তাআলা উত্তরে বলেছিলেন, "ইহা আল্লাহ্র অমোঘ আদেশ যে, মৃত্যুর পর পুনরায় কেউ ফিরে যেতে পারবে না" (ইবনে মাজা ও নিসাঈ)।

প্রমাণিত হলো যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) উপরোক্ত ঘটনা তাঁর জড় দেহে হয় নি। হ্যাঁ, তবে স্বপ্নযোগে সম্ভব।

তারপর লেখক উক্ত প্রবন্ধে বলেন, "হযরত রসূল করীম (সঃ) জিবরাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে 'বুরাকে চড়ে উর্ধ্বারোহণ করতে থাকেন। প্রথম আকাশে হযরত আদম (আঃ) দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আঃ) চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিস (আঃ) পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আঃ) ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা (আঃ) এবং সর্বশেষে সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়"।

প্রশ্ন এই যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) জড়দেহে একটি জড় বস্তুর উপর সওয়ার হয়ে সশরীরে আকাশে পাড়ি দিলেন। আকাশে যে সকল নবী রসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়েছে, তাঁরা কি সবাই জড়দেহ নিয়ে সশরীরে সেখানে বসবাস করেন নাকি সবাই মারা গিয়েছেন ? নিশ্চয়ই তারা মারা গিয়েছেন। তাহলে জড়দেহদারী হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পক্ষে মৃত নবী-রসূলগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হলো কী প্রকারে ? পাক কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, "জীবিত ও মৃত এক প্রকারের হয় না" (সূরাতুল ফাতির)। সুতরাং হযরত রসূল করীম (সঃ) জড় দেহে একটি জড় বস্তু 'বুরাক' নামক একটি জন্তুর পিঠে চড়ে সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়েছিলেন এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন নবী-রসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র মি'রাজ গমনকে অন্ধের হাতি দেখার ন্যায় হাতড়ানো, বাস্তবে ইহা কুরআন বিরোধী অবান্তর ও মনগড়া কাল্পনিক ধারণা। তবে, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর উপরোক্ত ঘটনাবলী অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক-স্বপ্ন যোগে হওয়া সম্ভব। পাক

কালামে আল্লাহ্তালা বলেন, "আমি তোমাকে যে স্বপ্নের দৃশ্য (মি'রাজ) দেখিয়েছিলাম, ইহা মানবগণের জন্য এক পরীক্ষা" (সূরা বনী ইসরাঈল)। আর একটি বিষয়ে কিছু না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আলেম ফাযেল, মাওলানা মুফতী নামে খেতাবপ্রাপ্ত নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ তো হযরত ঈসা (আঃ)-কে জীবিত সশরীরে আল্লাহ্তালার নিকটে তুলে রেখেছেন। প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ্তাআলা কোথায় থাকেন, সপ্তম আকাশে নাকি দ্বিতীয় আকাশে ? হযরত নবী করীম (সঃ) তো মি'রাজের রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ হয়েছিল দ্বিতীয় আকাশে মৃত নবী হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর সঙ্গে। মৃত ও জীবিত এক সাথে অবস্থান করতে পারে কুরআন ও বিজ্ঞানের কোন্ যুক্তি-প্রমাণের বলে ? "মৃত ও জীবিত এক প্রকারের হয় না" (সূরাতুল ফাতির)। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) মারা গিয়েছেন। হযরত ঈসা (আঃ) আজো সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এবং আবার তিনি আকাশ থেকে সশরীরে নেমে আসবেন ধারণা করা কুরআন ও বিজ্ঞান বিরোধী উদ্ভট কল্পনা ব্যতীত কিছু নয়।

প্রবন্ধকার বিজ্ঞানের প্রমাণ দিতে গিয়ে 'বুরাক'কে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'রকেট' ইত্যাদির সাথে তুলনা করেছেন। জ্ঞান করা উচিত যে, 'রকেট' একটি জড় বস্তু। আবার তিনি বলেছেন, "আমাদের জন্য মি'রাজের সবচেয়ে বড় তোহ্ফা হচ্ছে নামায"। হযরত রসূল (সঃ) বলেছেন, 'নামাযই মু'মিনের মি'রাজ"। প্রশ্ন এই যে, নামাযে মু'মিনগণ কি জড় দেহ নিয়ে সশরীরে আকাশে উঠে যায় ? "তাদের বাহ্যিক চর্ম চক্ষ অন্ধ হয় নি বরং অন্তর্দেশে যে চক্ষু আছে তা-ই অন্ধ"। "তারা বুঝবে না, এই জন্য তাদের চোখের উপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি এবং কর্ণ বধির করে দিয়েছি" (সূরাতুল কাহাফ)।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, হযরত রসূল (সঃ) মি'রাজ গমন সশরীরে হয়েছিল, অর্থাৎ 'বুরাক' নামক একটি জন্তুর পিঠে চড়ে সশরীরে মদীনা থেকে সপ্তম আকাশে গিয়ে আল্লাহ্তাআলার দিদার লাভ করেছিলেন, তা হলে একথাও কি ধরে নিতে হয় না যে, আল্লাহ্তাআলা সপ্তম আকাশে উজির, নাজির পাইক, পিয়াদা, চৌকিদার, দফাদার ইত্যাদি নিয়ে (নাউযুবিল্লাহ) বসবাস করেন ? আল্লাহ্তাআলা কোথায় থাকেন ?

পাক কালামে স্বয়ং আল্লাহ্তালা বলেন, পূব পশ্চিম যেদিকেই তাকাও সেদিকেই আল্লাহ্তালার মুখ" (সূরাতুল বাকারা)। "আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী তাঁর সিংহাসন।" (ঐ) "মানুষের প্রাণশীরা অপেক্ষা তিনি নিকটে।" আল্লাহ্তাআলা অনন্ত ও অসীম। তিনি সর্বক্ষণ সর্বজায়গায় বিদ্যমান। মি'রাজ হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর একটি অতি উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক স্বপ্ন-বা কাশ্ফ। তাযকেরাতুল আওলিয়া গ্রন্থ পাঠ করলে জানা যায় যে, হযরত বায়েজিদ বুস্তামী (রহঃ)-এরও মি'রাজ হয়েছিল। কিন্তু ইহাকে কেউ সশরীরে হয়েছিল বলে মনে করে না। উহাও একটি উচ্চাঙ্গের স্বপ্ন বা কাশ্ফ। তবে নবী ও গয়ের নবীর মি'রাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। শব্দটি 'বুরাক' নহে, 'বারকুন' আরবী শব্দ; অর্থ বিদ্যুৎ। অর্থাৎ খুব দ্রুত হয়েছিল। যেমন মি'রাজ থেকে ফিরে এসে তিনি দেখলেন তখনও তাঁর ওযূর পানি গড়িয়ে যাচ্ছে। দরজার শিকল নড়ছে। স্বপ্নে বা কাশ্ফ জগতে নিমিষে দেখেছিলেন বহু।

ভক্তির আতিশয্যে এক দল বলে থাকেন, "হযরত রসূল করীম (সঃ) যখন আরশে মোহাল্লায় গিয়ে উপনীত হলেন, তখন তাঁর জুতা ছিল। তিনি যখন তাঁর পায়ের জুতা খুলতে উদ্যত হলেন, তখন আল্লাহতাআলা বললেন, আহা, দোস্ত করেন কি, করেন কি, জুতা পায়ে নিয়েই চলে আসুন। আপনার পায়ের ধূলি দিয়ে আমার আরশকে ধন্য করুন (আস্তাগাফিরুল্লাহ্)। ঐরূপ শিরক বি'দাত দূর করে ঐশ্বরিক জ্ঞানের আলো দ্বারা সত্য ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ্তাআলা আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে কাদিয়ানে আবির্ভূত করেছেন। সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি– তাঁকে মেনে সঠিক ইসলামকে চিনুন। কুরআন ও হাদীসের সঠিক তত্ত্ব অবহিত হয়ে জ্ঞান ভান্ডারে সমৃদ্ধ হয়ে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র দিদার লাভ করুন।

–সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

ওয়াকফে নও মুজাহিদের সাথে পরিচিত হোন

বামে ঃ
নাম - আব্দুন নূর
নম্বর - এ ১২৫০৩
পিতা - আব্দুল হাই
নানা - মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ্
ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ডানে ঃ
নাম - তাহেরা মজীদ ও বুশরা মজীদ
নম্বর - বি-১৫৬৭
পিতা - মোহাম্মদ আব্দুল মজীদ
মাতা - রানু বেগম
দাদা - মরহুম ডাঃ নফির উদ্দীন
নানা - মরহুম নজরুল ইসলাম প্রধান
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম

ঈদের দিনে করণীয়

মোহতরম আব্দুল মাজেদ তাহের, লন্ডন

ঈদুল ফিতর ॥ রমযান মাস গত হয়ে যাওয়ার পরে ১লা সওয়াল তারিখে রোযার কল্যাণসমূহ লাভের সৌভাগ্য পাওয়ার আনন্দে ঈদুল ফিতরের উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। ঈদের নামাযের জামাত দ্বারা এক রঙ্গে মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। এজন্যে পুরুষ, নারী ও শিশু সবাই এতে অংশগ্রহণ করে।

*..... হযরত 'উম্মে আতীয়া বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন দুই ঈদের দিনে সব লোক নারী ও শিশু সহ ঈদের নামায পড়তে যাই। এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরও ঈদ ও ইহার দোয়ায় অংশ গ্রহণের জন্যে আদেশ দেয়া হোত। অবশ্য তারা নামাযে অংশ গ্রহণ করতেন না। বরং এ প্রসঙ্গে এত কড়াকড়ি নির্দেশ দিতেন যে, যদি কোন মেয়ের নিকট ওড়না না থাকে তাহলে কোন বান্ধবীর নিকট থেকে চেয়ে নেয় আর অবশ্যই ঈদে যোগদান করে (বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ঈদায়েন)।

আঁ হযরত (সঃ) কীভাবে ঈদোৎসব পালন করতেন

ঈদের এই কল্যাণজনক উৎসবের জন্যেও আঁ হযরত (সল্লাঃ) আদব-কায়দা শিখিয়েছেন এবং পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। ঈদের দিন আঁ হযরত (সল্লাঃ) বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দিতেন। গোসল করতেন, মেসওয়াক করতেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতেন। সামর্থ্য থাকলে নতুন কাপড় বানাতেন। এই জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করার জন্যে মুসলমানদের বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন।

*..... আঁ হযরত (সল্লাঃ) ঈদুল ফিতরের দিনের ভোর বেলায় বেজোর সংখ্যায় কিছু খেজুর খেয়ে ঈদের নামায পড়তে যেতেন। অথচ ঈদুল আযহার দিনে তিনি (সল্লাঃ) কুরবানীর মাংস দ্বারা খাবার আরম্ভ করতেন। তাঁর (সল্লাঃ) রীতি ছিল যে, তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন যেন মুসলমানদের উৎসবের মাহাত্ম্য লোকদের ওপরে প্রকাশিত হয় এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ ও আনন্দ করার অধিক সুযোগ লাভ হয়। আর উভয় রাস্তার বাসিন্দারা তাঁর (সল্লাঃ) নিকট থেকে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

*..... ঈদের দিনে খেলাধূলা এবং কুস্তি প্রতিযোগিতাও হতো। যেমন, হযরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, ঈদ উপলক্ষ্যে হাবশীরা ঢাল ও বর্ষা দ্বারা তাদের খেলা ও কুস্তির কৌশল দেখাতো। সম্ভবতঃ আমি আঁ হযরত (সল্লাঃ)-কে বলেছি বা তিনি নিজেই বলেছেন, তাদের খেলা-ধূলার কসরৎ কি দেখতে চাও ? আমি বল্লাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে তাঁর (সল্লাঃ) পিছনে দাঁড় করিয়ে নিলেন এমনভাবে যে, আমার গন্ডদেশ তাঁর গন্ডদেশের সাথে লাগানো অবস্থায় ছিল। তিনি খেলোয়ারদের খুবই উৎসাহ দিচ্ছিলেন। পরে আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন আঁ হযরত (সল্লাঃ) আমাকে বল্লেন, চলো, যথেষ্ট হয়েছে। আমি বল্লাম, হ্যাঁ। তিনি (সল্লাঃ) বল্লেন, বেশ চলো।

*..... হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার ঈদের দিনে দু'টি আনসারী কিশোরী আমার নিকট বসে যুদ্ধের কাহিনী-সম্মলিত গীত শুনাচ্ছিল। আঁ হযরত (সল্লাঃ) ঘরে আসলেন এবং অন্য দিকে মুখ করে বিছানায় শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) আসলেন এবং ঐ কিশোরীদের গীত গাইতে শুনে আমাকে ধমকালেন এবং বল্লেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাঃ)-এর ঘরে শয়তানী গীত? আঁ হযরত (সল্লাঃ) বল্লেন, হে আবূ বকর , প্রত্যেক জাতির একটি খুশীর দিন হয়ে থাকে আর এই আমাদের খুশীর দিন।

*..... উত্তম খাদ্য, সুন্দর কাপড়-চোপড় এবং খেলা-ধূলা তো বাহ্যিকভাবে আনন্দ খুশীর অভিপ্রকাশ ঘটায়। একজন মুসলমানের সত্যিকারের আনন্দ ও প্রকৃত ঈদ তো এই যে, তার খোদা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। এজন্যে ১ মাস রোযা রাখার পরে ঈদের দিনে মুসলমানগণ খোদাতাআলার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দু' রাকা'আত ঈদের নামাযও আদায় করে থাকেন। ঈদের দু' রাকা'আত নামায যে কোন খোলা মাঠে বা ঈদের মাঠে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে পড়া হয়ে থাকে। প্রয়োজনে ঈদের নামায জামে মসজিদে (যেখানে জুমুআর নামায পড়া হয়-অনুবাদক) পড়া যেতে পারে। ঈদের নামায বা-জামাতই পড়া যেতে পারে। একা একা পড়া জায়েয বা বৈধ নয়।

*..... হাদীস থেকে জানা যায় যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ) ঈদের দিন ঈদের মাঠে যেতেন এবং সর্বপ্রথম নামায আরম্ভ করতেন। নামায শেষ করে লোকদের সামনে দাঁড়াতেন। লোকেরা তাদের সারিতে বসে থাকতেন। হুযূর (সল্লাঃ) তাদের নিকট খুতবা দিতেন। জরুরী আদেশ-নিষেধের ঘোষণা দিতেন আর এথেকে অবসর হয়ে ঘরে ফিরে আসতেন।

*..... ঈদের খুতবাতে মহিলাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে এবং তাদের নিকট পর্যন্ত কথা পৌছানোর কোন মাধ্যম না থাকলে ইমাম সাহেব আলাদাভাবেও তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সুতরাং, আঁ হযরত (সল্লাঃ) এক ঈদের খুতবা দিলেন। এর পরে তিনি মহিলাদের সারির নিকটে গেলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁর (সল্লাঃ) সাথে ছিলেন। তিনি (সল্লাঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য ও উপদেশ-বাণী রাখলেন। স্বামীদের আনুগত্য করতে এবং ধৃষ্টতা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তাকিদপূর্ণ নিদের্শাদি দিলেন। আর সদকা-খয়রাত করার জন্যেও নির্দেশ দিলেন। হুযূর (সল্লাঃ)-এর তাহরীকের পরে মহিলারা হাত, কান ও গলা থেকে অলংকার খুলে খুলে হযরত বিলালের (রাঃ) চাদরের ওপরে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এর পরে রসূলে করীম (সল্লাঃ) চলে গেলেন।

*..... ঈদের নামাযে না আযান হয় আর না একামত। আকাশে সূর্য এক বল্লম পরিমাণ ওপরে ওঠলে ঈদের নামাযের সময় হয়। ঋতুর অবস্থা ভেদে ঈদের সময় লোকদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণতঃ ঈদুল ফিতরের নামায তুলনামূলকভাবে পরে এবং ঈদুল আযহার নামায আগে পড়া যায়। ইহাই সুন্নত।

*..... ঈদের নামাযের উভয় রাকা'আতেই কিরাত (সূরা পাঠ) উচ্চস্বরে পাঠ করা হয়। আঁ হযরত (সল্লাঃ) যখন ঈদের মাঠে বা মসজিদে পৌছাতেন আযান ও একামত ব্যতিরেকেই নামায আরম্ভ করে দিতেন এবং ইহাই সুন্নত যে, এর বাইরে কোন কর্ম-কান্ড না করা হয়। তিনি (সল্লাঃ) এবং তাঁর (সল্লাঃ) সাহাবা (রাঃ) যখন ঈদের মাঠে পৌছতেন তখন ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল ইত্যাদি নামায পড়তেন না এবং পরেও পড়তেন না। আর খুতবার পূর্বে নামায পড়তেন। প্রথম রাকা'আতে ধারাবাহিকতার সাথে সাতটি

তকবীর পাঠ করতেন এবং প্রত্যেক দুই তকবীরের মাঝে সামান্য বিরতি দিতেন। তকবীরের মাঝখানে তিনি (সল্লাঃ) কোন প্রকার বিশেষ যিক্‌র পাঠ করতেন বলে কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। প্রত্যেক তকবীরের সাথে সাথে রাফা'ইয়াদায়েন বা দু'টি হাত উত্তোলন করতেন। যখন তকবীর পাঠ শেষ করতেন তখন কিরাআত পাঠ আরম্ভ করতেন। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পরে কুরআন মজীদের সূরা **ক্বাফ'** এক রাকা'আতে পাঠ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে **একতারাবাতিস্ সাআত ওয়ান শাক্‌কিল ক্বমর** -পাঠ করতেন। প্রায়ই তিনি দু' রাকা'আতে **সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা ও হাল আতাকা হাদীসুল গশিয়া পড়তেন**। যখন কিরাআত পড়া শেষ হতো তখন তক্‌বীর বলে রুকূতে যেতেন। পরে এক রাকা'আত পুরো করতেন এবং সিজদা থেকে উঠে পুনরায় পাঁচ তকবীর ধারাবাহিকতার সাথে পাঠ করতেন। পরে কিরা'আত আরম্ভ করতেন। এভাবে প্রত্যেক রাকাআ'তের প্রারম্ভে তকবীরগুলো পাঠ করতেন এবং পরে কিরা'আত পাঠ করতেন।

*..... আঁ হযরত (সল্লাঃ) যখন নামায শেষ করতেন তখন লোকদের সম্মুখে দাঁড়াতেন। লোকেরা সারিবদ্ধভাবে বসে থাকতেন আর তিনি তাদের সামনে বক্তব্য রাখতেন ও নসীহত করতেন। ঈদের মাঠে কোন মেম্বর থাকতো না যার ওপরে উঠে খুতবা দিতেন। মদীনার মেম্বরও সেখানে নেয়া যেতো না বরং তিনি ভূমিতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করতেন।

*..... হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, আমি ঈদের দিনে নবী করীম (সল্লাঃ)-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত হয়েছি তখন তিনি আযান ও একামত ব্যতিরেকে খুতবার পূর্বে নামায পড়লেন। এর পরে হযরত বেলাল (রাঃ)-এর কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌কে ভয় করার আদেশ দিলেন, তাঁর আনুগত্যের প্রতি অনুরাগের কথা বল্লেন, এবং নসীহত করলেন আবার খোদাতাআলার পুরস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিলেন। পরে তিনি (সল্লাঃ) মহিলাদের দিকে গেলেন এবং তাদেরকেও উপদেশাবলী দান করলেন।

*..... হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার আঁ হযরত (সল্লাঃ)-এর পবিত্র ঈদ ও জুমুআ এক দিনেই একত্রিত হলো। তিনি (সল্লাঃ) ঈদের নামায পড়ালেন। এর পরে বল্লেন, ঈদের নামায জুমুআর নামাযের স্থলাভিষিক্ত এজন্যে যদি কেউ জুমুআর নামাযে আসতে না চায় তাহলে তার জন্যে এর অনুমতি রয়েছে। যদিও আমরা যথাসময়ে ইন্‌শাআল্লাহ্ জুমুআর নামায পড়বো (সুনানে ইবনে মাজাহ্, প্রথম খন্ড, কিতাবুল একামাতিস্ সালাত ওয়াস্ সুন্নাতু ফীহা বাব মা জাআ ফী মা ইযা ইজতিমাউল ইদায়েন ফী ইয়াওম) যদি ঈদের নামায প্রথম দিন সূর্য (পশ্চিমাংশে) হেলে যাওয়ার পূর্বে না পড়া হয় তাহলে ঈদুল ফিতর দ্বিতীয় দিন এবং ঈদুল আযহা তৃতীয় দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে পড়া যায়।

শওয়ালের ৬টি নফল রোযা

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এর পরে (ঈদের দিন বাদে) শওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে তার এত পুণ্য লাভ হয় যেন সে সারা বছর রোযা রেখেছে (মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম)।

নফল ঐ অতিরিক্ত ইবাদত যা বান্দা স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্যে পালন করে থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার নফল ও অতিরিক্ত ইবাদতের জন্যে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। রসূলে করীম (সল্লাঃ) এক হাদীসে কুদসীতে ঐ হাদীস যা নবী করীম (সল্লাঃ) আল্লাহ্‌র বরাতে বলেছেন, এগুলো ওহী-ইলহামের মাধ্যমে জানানো হলেও এগুলো কুরআন পাকের আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়–অনুবাদক) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে (বুখারী)।

নফল রোযারও অনেক পুণ্য রয়েছে। আঁ হযরত (সল্লাঃ) বিভিন্ন সময়ে নফল রোযার ঘোষণার কথা বলতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে বলেছেন। সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীসে রমযানের ৩০টি রোযার পরে শওয়ালের ৬টি রোযা রাখার তাকিদ করেছেন। এর পুণ্য সংবছর রোযা রাখার পুণ্যের সমগুণ সওয়াব বলে আখ্যায়িত করেছেন। হিসাবের ভাষায় এর মধ্যে রহস্য রয়েছে যে, একটি পুণ্যের প্রতিদান আল্লাহ্‌তাআলা দশগুণ দিয়ে থাকেন আর ৩৬টি রোযার প্রতিদান ৩৬০ দিনের সমান হয় যা কিনা ১ বছরের কাছাকাছি। কিন্তু রমযানের ফরয রোযার আসল মাহাত্ম্যের সাথে শওয়ালের রোযায় পুণ্যের ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং এ বিষয়ের অনুশীলন যে, রমযানের সাধনা ও উহার ইবাদত কেবল ১ মাস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং সংবছরে বিস্তৃত থাকে এবং রমযান ব্যাতিরেকেও সমগ্র মাসগুলোতে ঐসব পুণ্যের অভ্যাস থেকে যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যেভাবে রমযানের কল্যাণমন্ডিত মাসের এ সুফল লাভ হয়ে যায় ইহা সারা বছরই কি সারা যুগ ও সারা জীবন যেন রমযান হয় যাতে রমযানের ঐ কল্যাণসমূহ লাভ করা যায়।

রমযান মাসের এ ধারাবাহিকতাকে চলতি বছরে প্রবহমান রাখার জন্যে আঁ হযরত (সল্লাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা রাখে সে সওমুদ্ দাহর অর্থাৎ সংবছর রোযা রাখে এমন ব্যক্তির সমান হয়।

*..... হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে আঁ হযরত (সল্লাঃ) তিনটি ওসীয়্যত করেন। এর মধ্যে একটি এই ছিলো যে, প্রত্যেক মাসে তিনটি নফল রোযা রাখা (তিরমিযী)।

*..... হযরত আবূ যর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ) আমাকে বলেছেন, হে আবূ যর! যখন তুমি মাসে ৩ দিন রোযা রাখতে চাও তখন ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা রাখবে (তিরমিযী)। কিন্তু এসব তারিখ ব্যতিরেকেও আঁ হযরত (সল্লাঃ) প্রত্যেক মাসে রোযা রাখতেন। ইহা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (তিরমিযী)।

*..... নফল রোযার জন্যে রাত্রে নিয়্যত করার আবশ্যকতা নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সল্লাঃ) আমার নিকটে এসে জিজ্ঞেস করতেন যে, জল খাবারের জন্যে কিছু আছে কি ? আমি বলতাম, না। তখন তিনি (সল্লাঃ) বলতেন, বেশ আমি রোযা রেখে নিলাম (তিরমিযী)।

*..... নফল রোযা ভাঙ্গার জন্যে ঐ কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই যা কিনা ফরয রোযার জন্যে প্রয়োজন হয়। হযরত রসূলে করীম (সল্লাঃ) উম্মে হানি (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে পানি চাইলেন। হুযূর (সল্লাঃ) পানি পান ক'রে বাটি তাকে ফিরিয়ে দিলে তিনি (রাঃ) হুযূর (সল্লাঃ)-এর (পান করা) অবশিষ্ট পানি পান করলেন। পরে তাঁর (সল্লাঃ) নিকট নিবেদন করলেন "হুযূর ! আমার তো রোযা ছিলো ? আঁ হযরত (সল্লাঃ) বল্লেন, "কাযা রোযা তো ছিলো না ?"উম্মে হানী (রাঃ) বল্লেন, "না"। হুযূর (সাঃ) বল্লেন, "তাহলে কোন অসুবিধা নেই"। তিনি আরও বল্লেন "নফল রোযাদার স্বয়ং নিজের রোযার আমানতকারী। ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে ইচ্ছা করলে ইফতারও করতে পারে' (তিরমিযী)।

কিন্তু যদি রোযা ইফতার করা হয় তাহলে উহার বদলে একটি রোযা রাখতে হবে।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনালের ৩০ জানুয়ারী–৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী জনাব শেখ আব্দুর রশীদ সাহেব বাটালবী (রাযিঃ)

তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'বাটালা' নামটি আহমদীয়তের ইতিহাসে চিরদিনই অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই বাটালারই অধিবাসী ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব যিনি সর্বপ্রথম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন; অপরদিকে আহমদীয়া জামাতে গৌরবদীপ্ত ভূমিকা পালন করেও বাটালাবাসী আহমদীগণ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাদের একজন ছিলেন জনাব শেখ আব্দুর রশীদ সাহেব (রাযিঃ)। আমৃত্যু তিনি বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক জ্বালাতন ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, এমনকি শত্রুরা তাঁর বাড়ী পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে কিন্তু তিনি কখনো এক পা-ও পিছু হটেন নি, বরং সবসময়ই সামনে অগ্রসরমান ছিলেন। আল্লাহ্‌তাআলা হুযূর (আঃ)-এর প্রত্যেক সাহাবীরই মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, আমীন।

জনাব শেখ সাহেব বর্ণনা করেন ঃ

আমার মনে সর্বপ্রথম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার প্রেরণা জাগে ১৯০০ ইং সালে। এর পূর্বে হুযূরের প্রতি ধারণা আমার বিশেষ ভাল ছিল না। কারণ, আমার বাড়ীর আশেপাশে মোঘল বংশীয় কিছু পরিবার বসবাস করতেন, তাঁদের চালচলন, আচার ব্যবহার ভাল না হওয়াতে হুযূরের প্রতিও আমার মনোভাব ভাল ছিল না। কারণ, আমি জানতাম যে, হুযূরও মোঘল এবং হুযূরের চালচলনও এখানকার মোঘলদের মতোই হবে।

আমরা ওহাবী ছিলাম। আমাদের পরিবেশ ধর্মীয় ছিল। আমাদের বাড়ীতে আলেমদের আসর বসতো। আমার পিতা অত্যন্ত পরহেযগার মুত্তাকী ছিলেন। বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক প্রকাশকালে তিনিও একাজে অংশ নিয়েছিলেন। আমি যখন পথম কাদিয়ান আসি তখনও আহমদীয়ত এবং হুযূরের বিরোধী ছিলাম। এখানে এসে আমি প্রথম হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করি। পরে হযরত আকদস (আঃ) -এর খেদমতে হাজির হই। হুযূরকে দেখামাত্র মোঘলদের প্রতি আমার মনোভাব কর্পুরের ন্যায় উবে গেল। হুযূর সেদিন মেহমানদের সাথে গোল কামড়াতে বসে আহার করছিলেন এবং আমারও হুযূরের সাথে আহার করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আসরের নামাযের পর হযরত খলীফা আউয়াল (রাঃ) কুরআনের দরস দেন। তিনি অভূতপূর্ব সুন্দরভাবে তফসীর বর্ণনা করেন যে, আমি মোহিত হয়ে যাই। আমার এই সফরে মিঞা বরকত আলী নামে আমার একজন বন্ধুও সাথে ছিলেন। আমি কাদিয়ান থেকে রওয়ানা হলাম ঠিকই কিন্তু মন আমার সায় দিচ্ছিল না। অবশেষে বাটালা পৌঁছলেও কিন্তু মন পড়ে রইল কাদিয়ানে। বাটালায় এসেও আমার মনকে শান্ত করতে পারলাম না, মন চলে যেতো কাদিয়ানে। আমার অবস্থা আমার বন্ধু মিঞা বরকত আলীকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, কোন কাজেই তাড়াহুড়া করতে নেই, ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। তার কথায় আমার কোন পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় নি বরং আমি কাদিয়ানে চলে আসি। সাথে কিছু অভিযোগ লিখিত আকারে নিয়ে আসি।

কাদিয়ান পৌঁছে আমার অভিযোগ সম্বলিত প্রশ্নগুলো হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়ালকে দেখালাম, তিনি খুব সুন্দরভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর পেশ করেন। আমার অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পেরে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব বিরোধিতা শুরু করে দিলেন। কিন্তু আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আমার পিতা আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। আমি পাঁচ ছয় দিন অন্তর কাদিয়ান আসা আরম্ভ করি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমার জন্যে বেশী করে দোয়া করতেন এজন্যে যে, বাটালায় মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর কারণে এখানে বিরোধিতা বেশী হবে। আমি অনেকবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে বলেছি, হুযূর অনুমতি দেনতো আমি কাদিয়ান চলে আসি। বাটালায় থাকতে আমার এখন আর ইচ্ছে করে না। কাদিয়ান চলে এসে আমি ব্যবসা করতে চাই কিন্তু হুযূর প্রতিবারই আমাকে বারণ করেছেন এবং বলেছেন, কেবলমাত্র ধর্মের বিরোধিতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই পিতা-মাতার আদেশ মেনে চলতে হয়। তুমিও তা-ই করতে থাক। আমার ছেলে আব্দুল কাউয়ূমের জন্মের পর আমার মনে আগ্রহ জন্মালো যে, কাদিয়ান এসে হুযূরের সাথে নামায আদায় করি। মিঞা বরকত আলীকে জানালে তিনিও রাজী হয়ে যান। অতঃপর আমরা কাদিয়ান আসি। বরকত আলী সাহেব একদিন ও আমি তিনদিন কাদিয়ানে ছিলাম।

একবার মৌলভী খোদাবক্স নামক জনৈক আলেম যার পুস্তকের একটি দোকানও ছিল বাটালা আসেন। তিনি এসেই শোরগোল শুরু করে দিলেন, আমি এটা করবো ওটা করবো, মির্যায়ীদের বিতাড়িত করবো ইত্যাদি। তাঁর বসবাস ছিল নীলি দরওয়াজার মসজিদে। আমি মিঞা বরকত আলী সাহেবকে সাথে নিয়ে ঐ মসজিদে মৌলভী সাহেবের কাছে গেলাম। অতঃপর বরকত আলী সাহেব আমার দিকে ইশারাও করে মৌলভী সাহেবকে বললেন, ইনি মির্যায়ী, আপনি তাঁকে বুঝান। মৌলভী সাহেব বললেন, আমি বাহাস করবো। আমি বললাম, যদি বাহাস করতে চান তাহলে শর্তাবলী নির্দ্দিষ্ট করুন। তারপর শর্তাবলী ঠিক করা হলো। আমি পূর্ব থেকে অবহিত ছিলাম যে, আমি বাহাস করতে পারবো না, তাই, আমি ধরমকোট নিবাসী মৌলভী ফতেহদীন সাহেবকে মনোনীত করে রেখেছিলাম এবং ইচ্ছে ছিল সময় মতো তাকে ডেকে আনবো। বাহাসের বিষয় ঠিক করা হলো "ওফাতে ঈসা (আঃ) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা" সম্বন্ধে। স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হলো জনাব কাজী ইফ্‌ফত আলী সাহেবের দেওয়ানখানায়। শান্তি রক্ষার দায়িত্ব রইলো উভয় পক্ষের উপর। তারিখ ঠিক হলো তৃতীয় দিবস।

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী মৌলভী খোদাবক্স সাহেবকে বাহাস করার জন্যে নিষেধ করলেন এই বলে যে, বাহাস করলে এখানে আহমদীয়তের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে। কিন্তু মৌলভী খোদাবক্স সাহেব সে উপদেশ শোনেন নি। আমি লোক মারফত চিঠি লিখে ধরমকোটে মৌলভী ফতেহদীন সাহেবকে সংবাদ জানাই। তার জবাব অনুসারেই তিনি শুক্রবার দিন বিকেল ৪টার সময় এসে হাজির হন। কিন্তু মৌলভী খোদাবক্স সাহেব চিঠি লিখে পাঠালেন যে, আমার সাথে কে মোবাহালা করবেন তা আমি জানতে চাই। আমি আমার জবাব লিখে পাঠালাম। পুনরায় লিখে পাঠালেন যে, আমি মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ছাড়া অন্যকারো সাথে মোনাজারা (মোবাহালা) করবো না। এভাবে মৌলভী খোদাবক্সের সাথে মোনাজারার ব্যাপারটি শেষ হলো। এরপর আমি কাদিয়ান

এসে হুযূরের খেদমতে হাজির হই এবং যাবতীয় ঘটনা বর্ণনা করি। হুযূর আমার বর্ণনা শুনে মৌলভীদের বর্তমান অবস্থাতে হাসতে থাকেন এবং আমাকে পরামর্শ দেন যে, বাড়ী গিয়ে তোমার পিতামাতা ও আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক পরিষ্কার করে ফেল। কিন্তু হায়! আমার তো বাড়ীতে পা রাখাই অসম্ভব ছিল। আমি আহমদী হওয়াতে আমার পিতা খুবই চিন্তাযুক্ত থাকতেন এবং ফিরানোর জন্যে অনেক চেষ্টাও চালিয়েছেন। একবার একটি ঘটনা ঘটে গেলো। এবোটাবাদের একজন মৌলভী ছিলেন, যার নাম ছিল মৌঃ ফযল হুসেন। ঐ মৌলভী সাহেবের বেইজ্জত হওয়ার ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম লাহোরে। আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের এক জলসা হয়েছিল লাহোরে। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মৌঃ ফযল হুসেন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। জলসার প্রোগ্রামে তার বক্তৃতা করার জন্যে নাম নির্ধারিত না থাকা সত্ত্বেও তিনি বক্তৃতা করার জন্যে মঞ্চে উঠেন এবং বক্তৃতার নামে অবান্তর কথাবার্তা বলা শুরু করেন। শ্রোতৃমন্ডলী বিরক্ত হয়ে নানারূপ শ্লোগান দেয়া শুরু করেন এবং হাততালি দেয়া শুরু করেন। অবস্থার প্রেক্ষিতে জলসা কমিটির সেক্রেটারী তাঁকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন।

উপরোক্ত ঘটনার পরদিন মৌঃ ফযল হুসেন সাহেব মোহাম্মদ ইউসুফ তালুকদার সহ কতিপয় মৌলভী সহযোগে আমাদের বাড়ী আসেন। আমার তাঁদের আগমন সম্বন্ধে কিছু জানা ছিল না। আমার একজন আত্মীয় শেখ রহমত উল্লাহ সাহেব এসে আমাকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যান। বাড়ী গিয়ে মৌলভী ফযল হুসেনকে দেখতে পাই। আমাকে দেখে আমার পিতা আমাকে উদ্দেশ্য করে ধমকাতে থাকেন। ফযল হুসেন সাহেব অনেক মন ভুলানো কথা বলতে থাকেন এবং একথাও বলেন যে, আমি হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর যিয়ারত (দর্শন) করাতে পারি। আমি বললাম, এসব মন ভুলানো কথায় কাজ হবে না, আপনি আমাকে প্রবোধ দিন এবং হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর যিয়ারত করান। এরপর তিনি একবারে চুপ মেরে যান। অতঃপর আমি বললাম, আমি গতকাল লাহোরে আপনার এক নিদর্শন দেখেছি, যা এখন সকলের সামনে বলে দিচ্ছি এবং আমি লাহোরে ঘটে যাওয়া ঘটনা সবিস্তারে বলার পর আমার পিতা আমার উপর আরও ক্ষিপ্ত হলেন কিন্তু মৌলভী সাহেব একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এরপর আমি কাদিয়ান আসি এবং সমস্ত ঘটনা হুযূর (আঃ)-সমীপে জ্ঞাত করি। সব শোনার পর হুযূর (আঃ) পূর্বের ন্যায়ই আমাকে নসিহত করতে থাকেন যে, পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করো। আমার পিতা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

হুযূর (আঃ)-এর উত্তম রূপেই জানা ছিল যে, আমার পিতা আমার সাথে অবৈধভাবে কঠোর ব্যবহার করতেন। তদুপরি হুযূর (আঃ) নসিহত করতেন যে, তুমি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো। উত্তমরূপে তাদের সেবা করো। এই নসিহতের প্রভাবেই আমি আমার পিতা মাতার সেবা করতাম। এ সত্ত্বেও আমার পিতা আমাকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিতেন না। একদিন মিঞা রহিম বক্স নামক একজন লোক এসে আমাকে বললেন, তোমার পিতা অসুস্থ, তুমি বাড়ী চলো। আমি তাঁকে বললাম আমাকে তো বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতিই দেয়া হচ্ছে না, আমি কেমন করে বাড়ী যাবো? তবে, আপনি যদি আমার প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন; তাহলে আমি যেতে রাজী আছি। তিনি রাজী হলেন এবং আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। বাড়ী প্রবেশের পর আমার পিতা আমাকে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং অন্দর মহল থেকে বিদ্রূপ ও তিরস্কারসূচক কথাবার্তা কানে আসতে লাগলো। কিন্তু আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নসিহত অনুযায়ী কোন কিছুকে পরোয়া না করে আমার পিতার সেবায় রত হয়ে গেলাম।

আমি আমার পিতার এত অধিক সেবা-যত্ন করেছি যে, তিনি নিজেও তা অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং একথা স্বীকারও করেছিলেন। ডাক্তার হেকীম অনেক দেখানো হলো, চিকিৎসা অনেক করানো হলো। কিন্তু কোন কিছুতেই ফল হলো না। একদিন আমার পিতা আমার বড় ভাইকে বললেন, আব্দুর রশীদকে বল, কাদিয়ান গিয়ে হেকীম নূরুদ্দীন সাহেবকে [হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ)] যেন নিয়ে আসে আমাকে দেখার জন্যে। বড় ভাই মুন্সী দ্বারা হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাযিঃ)-এর নিকট পত্র লেখানোর পর আমাকে দিলেন এবং আমি কাদিয়ান রওয়ানা হই। কাদিয়ান এসে জানতে পারি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। অনেক ভেবে চিন্তে হুযূরের খেদমতে আমার আগমন-বার্তা পাঠালাম। হুযূর আমার প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে আমাকে উপরে ডাকলেন। আমি হুযূরকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করলে হুযূর বলেন, জনাব মৌলভী সাহেবকে পাঠাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যদি এদিক-সেদিক হয়ে যায় তাহলে ফলাফল খারাপ হয়ে যেতে পারে। হুযূরের এ উত্তর শোনার পর আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো এবং মন্দ ধারণার উদ্রেক হলো যে, হুযূর স্বয়ং অসুস্থ বলে জনাব মৌলভী সাহেবকে পাঠাতে চাচ্ছেন না। অতঃপর আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাযিঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আমার পিতার রোগের বিষয় জানালাম। তিনি বললেন আমার বাটালা যেতে কোন আপত্তি নেই, তবে হুযূরের কাছ থেকে অনুমতির প্রয়োজন আছে। এই বলে তিনি হুযূরের অনুমতির লক্ষ্যে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। আমি হুযূরের খেদমতে চিরকূটটি পেশ করলে, হুযূর পুনরায় আমাকে দেয়া উত্তরই লিখে দেন চিরকূটে এবং আমি এটা নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাযিঃ)-এর খেদমতে পেশ করি। এটি পাঠ করার পর হযরত মৌলভী সাহেব বললেন, আমিতো যেতে পারছি না। আমার এখানে আব্দুল্লাহ্ আরব নামে আমার এক ছাত্র আছেন। তুমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তিনি হেকীম বিদ্যায় পারদর্শী সুতরাং, হযরত সাহেবের কথানুযায়ী আমি আব্দুল্লাহ্ আরব সাহেবকে নিয়ে গেলাম। তিনি আমার পিতার জন্যে ব্যবস্থাপত্র দেয়া শুরু করেন কিন্তু আমার পিতা ঐ ঔষধ খেতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর তিনি তিন চার দিন পর ইন্তেকাল করেন। আমার পিতার ইন্তেকালের পর আমার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কথা স্মরণ হলো এবং আমার মধ্যে যে কুধারণার জন্ম নিয়েছিল এজন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, কেন হযরত আকদস (আঃ)-মৌলভী সাহেবকে পাঠাতে রাজী ছিলেন না। যদি হযরত নূরুদ্দীন সাহেব আমার পিতার চিকিৎসা করতেন এবং আমার পিতা মারা যেতেন তাহলে এ সন্দেহও করা সম্ভব ছিল যে, হযরত মৌলভী সাহেব ঔষধের সাথে বিষ মিশিয়েছেন। এ ঘটনার পর আমার ঈমান এবং হুযূরের প্রতি আমার ভালবাসা আরও বেড়ে গেলো; বিরোধী দল আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে কিন্তু খোদাতাআলা আমাকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন এবং যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন (আল্ হাকাম ঃ কাদিয়ান, ৩৯বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)।

সংকলন ও অনুবাদ–আহসান উল্লাহ্ সিকদার
(মরহুম)

রিপোর্টার–সুনীল ব্যানার্জি

জনগণ এ উদ্বেগের তেমন কোন সুফল পেয়েছেন মনে হয় না। অদূর ভবিষ্যতে পাওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এ উদ্বেগকে সুষ্ঠু প্ল্যান প্রোগ্রামের মাধ্যমে কার্যকর করা খুবই জরুরী। এ কাজে বিলম্ব করার তাৎপর্য হবে আরো তলিয়ে যাওয়া।

২২-১২-৯৭ তারিখের ভোরের কাগজে 'অপরাধী যখন পুলিশ' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে কিছুটা বড় অক্ষরে কয়েক লাইনে এর সারমর্ম বলা হয়েছে। এখানে ঐ সারমর্মটির উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ

আমাদের দেশে পুলিশ সম্পর্কে একটি নেতিবাচক ধারণার পাশাপাশি পাশ্চোত্যের পুলিশ সম্পর্কে এক রকম উচ্চ ধারণা সাধারণ্যে চালু আছে। কিন্তু সম্প্রতি পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রেই যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে, তা থেকে মনে হতে পারে,সারা বিশ্বে তাদের কমবেশী একই রূপ, একই চেহারা। মার্কিন পুলিশ বাহিনীর ভিতরকার কিছু অন্ধকার দিক উন্মোচিত হয়েছে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায়। কীভাবে সেখানকার পুলিশ নানান অন্যায়, ক্ষমতাবহির্ভূত কাজ করে 'টাইম' অবলম্বনে তা তুলে ধরেছেন শাকিলুর রহমান।

বর্বরতার খেসারত হিসেবে। সিটি কন্ট্রোলার অফিস সূত্র এই তথ্য দিয়েছে।

[দৈনিক ইনকিলাব, ৩.১০.৯৯]

নিউইয়র্কের পুলিশ রাষ্ট্র প্রধানদেরও বাধা দেয়

নিউইয়র্ক থেকে রয়টার ঃ

কূটনীতিকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করার দায়ে নিউইয়র্ক পুলিশকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি পুলিশ বিশ্বসংস্থার সদর দফতরে প্রবেশকালে রাস্তা পেরুনোর সময় রাষ্ট্র প্রধানদের গতিরোধ করে। স্বাগতিক দেশের সাথে সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটিকে আর্জেন্টিনার রিকার্ডো লুইস বোকালান্দ্রো একথা জানান। ল্যাটিন আমেরিকান এবং ক্যারিবীয় গ্রুপভুক্ত দেশগুলোর পক্ষে বোকালান্দ্রে আরো বলেন, পার্কিং টিকিটের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়টি সুবিদিত। [দৈনিক সংবাদ-২৯.৭.২০০০]

৮.১.২০০০ তারিখের ভোরের কাগজে প্রকাশিত খবরের হেডলাইন ছিলোঃ কেলেঙ্কারির দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করেছেন জাপানের পুলিশ প্রধান 'জনমনে আস্থা ফেরাতে চাই' পদত্যাগের উদ্দেশ্য মহৎ। এ উদ্দেশ্য পূরণ হউক এটাই কাম্য। এ যামানায় সৎ উদারহরণ খুবই বিরল।

গত ৭/৮ মাসে ৮টি পত্রিকা হতে পুলিশের দুর্নীতি সম্পর্কে ১৮টি সম্পাদকীয়, একই সময়ের মধ্যে ১১টি কলাম লেখা এবং মামলার ৪টি রায় সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া দৈনিক গুলোতে রোজই

উটেচড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

(৬১ তম কিস্তি)

পুলিশের অপরাধজনিত খবরাদি প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিকগুলোও নীরব নয়। এগুলোও পুলিশি যুলুম সম্বন্ধে প্রচুর লেখালেখি করে চলেছে।

এখানে একটি পুরো সম্পাদকীয়, কয়েকটি সম্পাদকীয় হতে অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি, কিছু সম্পাদকীয়ের ও কয়েকটি লিখিত কলামের শিরোনাম দেয়া হলো ঃ ৭.৯.৯৯ তারিখের প্রথম আলোর ২য় সম্পাদকীয়টি ছিলো ঃ **পুলিশ এবং ছিনতাইকারী।**

দুজনের অভিন্ন ভূমিকা কীভাবে হয় পুলিশ ঢাকা কলেজের দুজন ছাত্রের কাছ থেকে একটি সোনার চেইন ও ১০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার রাত ১১টায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রধান গেটে। পুলিশ আর ছিনতাইকারীর অভিন্ন ভূমিকা অবিশ্বাস্য হলেও অন্তত বাংলাদেশে যে অসম্ভব নয় তা দেখা গেলো। এ ঘটনায় পুলিশের ম্রিয়মাণ ভাবমূর্তি আরো খানিকটা খাটো হলো।

এর আগে গেন্ডারিয়া এলাকায় দিনে দুপুরে ছিনতাইকারীরা এক দম্পতির ওপর হামলা করলে অনতিদূরে পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসী পুলিশদের আটক করে। এ ঘটনায় বুঝা যায়, মানুষ আজ পুলিশের ভূমিকাকে কতো সন্দেহের চোখে দেখে।

পুলিশ আর ছিনতাইকারী থাকবে দুই মেরুতে। কিন্তু আমাদের দেশে চিত্রটা প্রায়ই উল্টে যায়। পুলিশ আর ছিনতাইকারীর মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণটি বেশ জটিল হওয়ারই কথা। কিন্তু সেই জটিল সমীকরণের এতো সহজ সমাধান বের করতে পারা আমাদের পুলিশের উচ্চমানের মেধার পরিচায়ক বটে। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে যেন, ফ্রি স্টাইল ছিনতাই চলছে চলুক, পুলিশ দেখবে কিন্তু অ্যাকশনে যাবে না। আর কোথাও ছিনতাইকারীর অভাব দেখা দিলে সেই শূন্যস্থান পূরণে তারা এগিয়ে আসতে কার্পণ্য করবে না।

তাহলে দেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য অন্য কোনো কারণ খোঁজার দরকার আছে কি ?

২০.৫.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের ২য় সম্পাদকীয় 'সর্ষের মধ্যে ভূত' এর প্রথম প্যারার প্রথমাংশ হলো ঃ 'গত বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সড়ক ও নৌপথে ডাকাতি, চোরাচালানসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সঙ্গে পুলিশের জড়িত থাকার বিষয় নিয়ে পুলিশ প্রশাসন উদ্বিগ্ন।'

২৩.২.২০০০ তারিখের সংবাদ এর সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ও প্রথম প্যারার প্রথম কয়েক লাইন হলোঃ **অপরাধী পুলিশের বিচার**

সমাজে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অপরাধ দমনের লক্ষ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করা এবং আইনের আওতায় নিয়ে আসা পুলিশের সততা দক্ষতা। আন্তরিকতাই প্রধান ভরসা। কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী তাদের সুনাম ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

২৫.১১.৯৯ তারিখে দৈনিক প্রভাত 'অপরাধ এবং অপরাধী' শিরোনামে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর প্রথম প্যারার প্রায় অর্ধাংশ ছিলো ঃ

অপরাধ এবং অপরাধী

গত মঙ্গলবার পত্রিকান্তরে অপরাধ সংক্রান্ত দুটো খবর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। খবরের ঘটনাস্থল রাজধানীর বাইরে। আলোচ্য দু'টি সংবাদের ক্ষেত্রেই পুলিশের জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ হচ্ছে নাগরিকদের জানমালের রক্ষক। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যদি তারা বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তা হলে সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তার কোনই নিশ্চয়তা থাকে না। সিলেটে একজন ছোটখাট ব্যবসায়ীকে শর্টগানের গুলীতে হত্যা করে লক্ষাধিক টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে পুলিশের কয়েকজন সদস্য। কিন্তু তারা শেষ রক্ষা করতে পারে নি। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে জনতার ধাওয়ার মুখে তারা ধরা দিতে বাধ্য হয়। অবশেষে পুলিশ এসে ছিনতাই-এর অভিযোগে এদের গ্রেফতার করে। ঘটনাটি যে খুবই বেদনাদায়ক তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে পুলিশ বাহিনীর উপর তাতে যদি এভাবে চিড় ধরতে শুরু করে তাহলে লাভ হবে সমাজ বিরোধীদেরই। শান্তিপ্রিয় যারা তাদের দুর্ভোগই কেবল বৃদ্ধি পাবে। তবে দ্বিতীয় যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মনে হয় আরও অধিকতর উদ্বেগজনক। প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে লঞ্চ ডাকাতির বহু খবরই পত্রিকায় ছাপা হতে দেখা যায়। এসব ডাকাতিতে কত জনই সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কত লোকের জীবনহানি হয়েছে তার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর ও লোমহর্ষক ব্যাপার হলো যে, অনেক লঞ্চ ডাকাতির পেছনে পুলিশের লোকজনই নাকি জড়িত।

১১.৩.৯৮ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠের ২য় সম্পাদকীয় **'অপরাধ এবং পুলিশের ভূমিকা'** এর প্রথম প্যারার প্রথমাংশ হলো ঃ

দেশে কি অপরাধ বাড়ছে? পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যায় অপরাধের মাত্রা বাড়তির দিকে। বাংলাদেশ পুলিশের নিয়মিত প্রকাশনা

'ডিটেকটিভ'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলা হয়েছে, সারা দেশে অপরাধ বেড়েছে। ১৯৯৭ সালে গত দশ বছরের তুলনায় রেকর্ডসংখ্যক অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৭ সালে দেশে এক লাখ দু'হাজার ১শ' ৬১টি অপরাধের ঘটনা পুলিশের নথিভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৩ হাজার ৩শ' ১০। প্রতিবেদনে বিগত ৪ বছরের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতিবছর গড়ে ১০ হাজার করে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিম্নে কিছু সম্পাদকীয়ের শিরোনাম দেয়া হলো ঃ

দৈনিক জনকণ্ঠের ২৮.৪.২০০০ তারিখের ২য় সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিলো 'পুলিশই অপরাধী হচ্ছে'

৯.৪.২০০০ তারিখের যুগান্তরের ২য় সম্পাদকীয়ের হেডলাইন ছিলো 'পুলিশ ও ঘুষ'

১৭.৪.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের ২য় সম্পাদকীয়ের 'অপরাধ বৃদ্ধির পিছনে পুলিশ'

৩.৫.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম সম্পাদকীয়ের শিরোনামে ছিলো ঃ 'সর্ষের মধ্যে ভূত'

১৭.১২.৯৯ তারিখে আজকের কাগজের সম্পাদকীয়ের হেডলাইন ছিলো ঃ 'সর্ষেতে ভূত'

২৭.৫.৯৭ ও ২৬.১২.৯৯ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠের ২য় সম্পাদকীয় দু'টোর একই শিরোনাম ছিলো ঃ 'পুলিশের চাঁদাবাজি'। উল্লেখ্য যে, বক্তব্য হুবহু এক ছিলো না।

কলামিষ্টদের কিছু মন্তব্যের শিরোনাম ও অংশবিশেষ ঃ ৭-২১ জুলাই, ২০০০ তারিখের জনকণ্ঠ পাক্ষিক এ 'বেপরোয়া পুলিশ?' শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটির লেখক হলেন জনাব শামছুর রহমান। এর প্রথম প্যারার প্রথমাংশ হলো ঃ 'বেপরোয়া পুলিশ' কথাটির মধ্যে কলকাতা পুলিশের জনক গোবিন্দরামের ভাবমূর্তি যেন মিশে আছে। 'গোবিন্দরামের ছড়ি' কিংবা ছড়ি ঘোরানো বাকবিধি চালু হয়েছিল ওই গোবিন্দরাম মিত্রকে কেন্দ্র করেই। অধুনা মাছের রাজা ইলিশ/স্বামীর রাজা পুলিশ বাক্যের মতোই অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় 'গোবিন্দরামের ছড়ি' উচ্চারিত হলে পুলিশের দাপটের বিষয়টিই উন্মোচিত হতো।'

একই পাক্ষিকে 'পুলিশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে কেন?' এর এক স্থানে বলা হয়েছে, ১৯৯৯ সালে ১৯ ও ২০ এপ্রিল প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের জন্য বিশ্বব্যাংক যে প্রতিবেদন তৈরী করেছিল তাতে পুলিশকে 'সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রায় একই সময় হাইকোর্টের অভিমত ছিল এরকম 'পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে।' (সূত্র॥ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা) আহমেদ শাহাবুদ্দীন।

একই পত্রিকায় বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন– কনক সরওয়ার। এর এক স্থানে মন্ত্রী বলেন ঃ এ থেকে (বর্তমান অবস্থা থেকে) উত্তরণের জন্য আমি মনে করি, দেশে পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং নির্ধারিত দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া যাবে না। এবং দীর্ঘদিন গণতন্ত্র না থাকায় এদের ট্রেনিং ও জবাব দিহিতা, মোটিভেশন কিছুই নেই। এ কাজগুলো না করা পর্যন্ত আপনারা পুলিশের এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন না।'

উক্ত পত্রিকায় 'নারী নির্যাতন পুলিশ যখন অভিযুক্ত' লেখাটির একস্থানে লেখক (মাহমুদ শামসুল হক) বলেন, 'বিশেষ করে ১৯৮০'র দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এক শ্রেণীর পুলিশ নারী নির্যাতন তথা ধর্ষণজাতীয় অপরাধে ভেঙ্গে ফেলল আগের সকল রেকর্ড। আইন-শৃংখলা রক্ষকদের হাতে পর পর জীবন দিল একাধিক শিশু-কিশোরী। সম্ভ্রম হারলো অনেকে। এমনকি পুলিশ কর্তৃক নারীর বস্ত্রহরণের ঘটনাও ঘটল প্রকাশ্যে। একই পত্রিকায় 'পুলিশের উপর পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিব' লেখাটির শেষ প্যারায় লেখক (মাশাহ) বলেছেন, 'পরিশেষে একটি অঙ্গীকার করিয়া অত্র রচনা হইতে নিবৃত্ত হইব। তাহা হইল ঃ অদ্য সেচ্ছায়, সজ্ঞানে অগুণতি গুণীজনের প্ররোচনায় উচ্চ-নিম্ন সমুদয় পুলিশদিগকে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাহারা যদি দুই হাজার এক সালের একত্রিশ ডিসেম্বর রাত বারটা এক মিনিটের মধ্যে তাবত দুষ্টের দমন করতঃ বঙ্গজনের মুখে হাসি ফুটাইতে পারেন এবং জনগণের যথাযথ বান্ধব হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হয়েন –তাহা হইলে নর-নারী নির্বিশেষে তের কোটি মনুষ্য মিলিয়া তাহাদের উপর একযোগে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিব।' এরূপ আশা করা যতই কাম্য হউক না কেন মানুষ কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে ভাল বা মন্দ সৎ বা অসৎ হতে পারে না, তবে বড় মাপের মহান নেতৃত্বের পরশে তা দ্রুত হতে পারে।

১৪.৫.২০০০ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত 'খুন-সন্ত্রাস ও পুলিশি তৎপরতা' (লেখক জনাব নাসির আহমেদ) এর শেষ ৫ লাইন হলো ঃ 'আমরা আশা করব, পুলিশের অভ্যন্তরে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে অন্ততঃ অপরাধীদের প্রশ্নে শুদ্ধি অভিযান চালানোর দিকটি সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। তা হলেই সন্ত্রাসমুক্ত একটি সুস্থ সমাজ নিশ্চিত করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন কেবল সংশ্লিষ্ট সকলের সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা'। একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, দেশের রাজনীতি কলুষমুক্ত হলে বর্তমানে বিরাজিত সব ধরনের অপরাধ প্রবণতাই আশাতীতভাবে হ্রাস পাবে। এখানেই অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রেই বড় 'কিন্তুটি' লুকিয়ে আছে।

৫.৭.২০০০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে 'এমনি অবস্থা আর কতকাল চলবে?' [লেখক বোরহান আহমেদ] এর শেষ কয়েক লাইনে বলেছেন, 'পুলিশের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগই তদন্ত করবে পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তারা। 'কাকের মাংস কখনই কাকে খায় না' বলে একটা প্রবাদ আছে। তাই অপরাধী পুলিশ সদস্যকে শাস্তিস্বরূপ কোন দুর্গম স্থানে বদলি করা হয় কখনও কিন্তু ঐ পর্যন্তই।' সরকার নতুন আইন করে পুরানো ব্যবস্থা দূর করে জনমনে পুলিশের প্রতি আস্থা সৃষ্টির পথ করতে পারেন।

৪.৩.২০০০ তারিখের দৈনিক প্রভাতে জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখিত 'একুশ শতকে বাংলাদেশের পুলিশ বাস্তবতা ও প্রত্যাশায়' অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। এখানে এর অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দেয়া হলো ঃ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও সংঘাতময় থাকলে পুলিশের কর্মপরিধি অযাচিতভাবে বেড়ে যায়। আমাদের শিক্ষাঙ্গণগুলোতে অসহিষ্ণু রাজনীতির কারণে সংঘাতের পরিবেশ লেগেই থাকে। সেজন্য প্রচুর পুলিশ এসব শিক্ষাঙ্গণে মোতায়েন করতে হয়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। এজন্য কয়েকজন ইন্সপেক্টর ও সাব ইন্সপেক্টরসহ প্রায় দেড়শত পুলিশকে ক্যাম্পাসগুলোতে মোতায়েন করতে হয়। এর বাইরেও শত শত পুলিশকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শান্তিরক্ষায় দায়িত্বে নিয়োজিত রাখতে হয়। এই সংখ্যক পুলিশ দিয়ে অতিরিক্ত কয়েকটি থানা পরিচালনা করা যেত। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ কেন থাকবে, এই প্রশ্নটি সচেতন নাগরিক মাত্রই করতে পারেন। বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এরকম পুলিশ প্রহরা শিক্ষাঙ্গণগুলোতে থাকে কিনা, আমরা জানি না। এমনটি ঘটছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার জন্য। এই বাস্তবতা যদি পাল্টায়, যদি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধ সংঘটিত না হতে পারে, যদি আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়া হয়, তাহলে পুলিশের বাস্তবতাটি অনেকটাই সহনীয় হবে।

এদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা ক্রমাগত অবক্ষয়ের স্রোতে ভেসে চলেছে। এতে সমাজব্যবস্থার কল্যাণকর দিকগুলো ভেংগে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রাজনীতি পরিচালনের নেতারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তো দূরের কথা বরং এতে তারা ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন। নৈতিকতাবোধকে তারা বোকামি বলে গণ্য করছেন। এর প্রতিফলন প্রকটরূপ ধারণ করে চলেছে। (চলবে)

–মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

হোমিওপ্যাথি

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

-হযরত মির্যা তাহের আহমদ

একোনাইট নেপেলাস

Aconitum Napellus

(Monts Hood)

হোমিও দর্শনকে যদি আপনি ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারেন আর একে রপ্ত করে নেন তাহলে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ রোগ-ব্যাধিকে গোঁড়াতেই প্রতিরোধ করা সম্ভব, এতে বাড়তি জটিলতা সৃষ্টিই হবে না। **রোগের সূচনায়** যে সব ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় এগুলো মাঝে **এক নম্বর ঔষধ একোনাইট**। এর পূর্ণ নাম Aconitum Napellus. উর্দূতে একে 'মিঠা তিলিয়া' বলা হয় কিন্তু সাধারণভাবে এটা একোনাইট নামেই সুপরিচিত।

এটা একপ্রকার বিষ, মানবদেহের বিভিন্ন অংশে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের বইতে অন্যান্য প্রচলিত বিষ আর ঔষধের মাঝে এরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিস্তারিতভাবে আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ডাক্তার হ্যানিমান আর অন্যান্য হোমিও গবেষকরা নিজেদের উপর একে প্রয়োগ (Proving) করে এর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

পরীক্ষণ পদ্ধতিতে একোনাইট বা অন্য কোন বিষকে তাদের অবিকৃত প্রকৃত অবস্থায় ব্যবহার করা হয় না বরং লক্ষণ পরীক্ষণের যে নীতি হ্যানিমান উপস্থাপন করেন আর একোনাইটের মাধ্যমে যা সাব্যস্ত করেন তা হলো ঃ যদি একটি বিষকে মিশ্রিত করতে করতে এত হালকা করে ফেলা হয় যাতে সেটা একেবারে সূক্ষ্ম হয়ে যায় আর তার বিষাক্ত প্রভাব একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে -এই ক্ষীণ সূক্ষ্ম বিষকে যদি কোন সুস্থ মানুষের দেহে বারে বারে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই দেহ এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে পরাস্ত হয় আর দেহে সেই প্রকৃত বিষের লক্ষণাদি প্রতিভাত হয়। তবে প্রকাশিত এই লক্ষণাদি মারাত্মক ক্ষতিকর কিংবা স্থায়ীভাবে ক্ষতির কারণ হয় না বরং এগুলো ক্ষীণ আর অস্থায়ী লক্ষণ হয়ে থাকে। এসব লক্ষণ দ্বারা বিষটির প্রকৃতি অতীব সূক্ষ্মভাবে আরো বিস্তারিত আকারে অনুধাবন করা সম্ভব। Proving নামে পরিচিত নিরীক্ষণের এই পদ্ধতি বিষ বা ঔষধের গুণাগুণ যাচাইয়ের অতীব কার্যকর পন্থা সাব্যস্ত হয়। এই পরীক্ষণকালে একোনাইটের যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এগুলোর মধ্যে **চরম ভীতি বা আতঙ্ক**, রোগের প্রাবল্য আর রোগের **আকস্মিকতা** উল্লেখযোগ্য। এর ব্যাধি হঠাৎ আক্রমণ করে আর এতে রোগী মনে করে এই রোগ থেকে সে নিষ্কৃতি করতে পারবে না।

একোনাইট সাধারণতঃ শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ার ঔষধ হিসেবে খ্যাত। কেননা এর ব্যাধি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শুষ্ক আর শীতল জলবায়ুতে আক্রমণ করে থাকে। কিন্তু শীতল আর শুষ্ক মৌসুমের রোগ ব্যাধিতেই যে কেবল একোনাইট কাজ করবে এমন কোন কথা নেই। যে কোন ঋতুতে এমন প্রত্যেক রোগ যার সূচনায় আকস্মিকতা, প্রাবল্য দেখা যায়, সেই সাথে চরম আতঙ্ক যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে নির্দিধায় একোনাইট ব্যবহার করা উচিত।

একোনাইট-কে যদি রাসটক্সের সাথে **একত্রে** প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই ব্যবস্থাপত্র রোগ-ব্যাধির সূচনাতে আরও বেশী কার্যকর আর ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয়। আমার বিচারে এটা Aspirin- এর সর্বোত্তম স্থলাভিষিক্ত ঔষধ? এমন প্রতিটি রোগ যার সূচনাতে জ্বর আর অস্থিরতা দেখা দেয় আর রোগী কিছু একটা ঘটার ভয়ে আশঙ্কাগ্রস্ত থাকে একোনাইট আর রাসটক্স ২০০ শক্তিতে দু'তিনবার সেবন করলে রোগটিকে গোড়াতেই দমন করা যায়। আমার বর্তমান সিকিউরিটি অফিসার (রিটায়ার্ড মেজর মাহমুদ আহমদ) আমাদের সাথে সাইকেল-ভ্রমণে বের হন। ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল আর শীতও ছিল প্রচন্ড। আমরা সবাই ভিজে গেলাম। পরদিন তাঁর জ্বর হলো, সেই সাথে গা-ব্যাথাও ছিল। তাঁকে একোনাইট ২০০ আর রাসটক্স ২০০ (Aconite 200+ Rhustox 200) একত্রে আর আর্নিকা ২০০ এবং ব্রাইওনিয়া ২০০ (Arnica 200+ Bryonia 200) মিশিয়ে পালাক্রমে আধা ঘন্টা পর পর সেবন করতে বললাম। কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁর রোগের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট রইল না আর পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি পুনরায় ডিউটিতে এসে যোগ দিলেন। শীতে গা ভিজে গিয়ে যদি অসুখ হয় তবে কেবল একোনাইট আর রাসটক্সের উপর নির্ভর করা উচিত নয় বরং আর্নিকা আর ব্রাইয়োনিয়াকে মিশিয়েও পালাক্রমে সেবন করা উচিত।

উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে রপ্ত করেছি। এর সাথে অন্ত্রনালীর, **ফুসফুসের** আর **কালোজ্বরেরও** সম্পর্ক আছে আবার **ম্যালেরিয়া** আর **আমাশাতেও** এই ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর। কখনো কখনো রোগের ধরন এমন হয় যে, তখন এই ঔষধগুলো সেটাকে রোধ করতে সক্ষম হয় না। (এদের পরিবর্তে রোগ সদৃশ ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ না করা পর্যন্ত তখন গত্যন্তর থাকে না। কখনো কখনো ইনফ্লুয়েঞ্জার সূচনায় একেবারে প্রারম্ভে এই ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ না করলে এটা ব্যর্থ হয়ে যায়। একটু বিলম্ব হলেই অন্যান্য সদৃশ ঔষধ দিতে হবে।

কালের-ব্যাপ্তীর দিক দিয়ে রোগ-ব্যাধি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো **নতুন পীড়া** (Acute) অর্থাৎ যা হঠাৎ আকস্মিকভাবে প্রাবল্যের সাথে আক্রমণ করে। এইগুলি সঠিক চিকিৎসা সাপেক্ষে তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয়। দ্বিতীয় প্রকার রোগ হলো, **পুরাতন পীড়া** (Chronic) যা ধীরে ধীরে মানবদেহে বাসা বাঁধে। পুরাতন পীড়াও অনেক ধরন আছে। কয়েক রকম পুরাতন পীড়া কিছু সময়ের জন্য আক্রমণ করে যেমন টাইফয়েড ইত্যাদি। আবার কয়েক ধরনের রোগ দীর্ঘ সময়ের জন্য শরীরে আঘাত করে যেমন ঃ যক্ষা, এজমা কিংবা গ্ল্যান্ডের স্ফীতি বিকৃত হয়ে ক্যান্সারে রূপান্তর। **নতুন পীড়া** (Acute) ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঔষধসমূহের তালিকায় একোনাইট শীর্ষস্থানের অধিকারী।

মূত্রথলী বা **কিডনির ব্যথা** দেখা দিলে **Aconite 1000 & Belladona 1000** একত্রে মিশিয়ে পনের মিনিট বিরতি দিয়ে দুই বার সেবন করালেই অনেক রোগী তাৎক্ষণিক উপকার লাভ করেন। তবে কিডনির খিচুনী ব্যথার যদি গরম সেক প্রদানে উপশম হয় তাহলে উপরোক্ত ব্যবস্থা-পত্র কোন কাজে লাগবে না। এটা কেবল গরম সেঁক প্রদানে কষ্ট বাড়ে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে কার্যকর। যেসব ক্ষেত্রে গরম সেঁক উপকার বোধ হয় সেসব ক্ষেত্রে **কলোসিন্থ** (Colosinth) CM-এর এক ষ্ট্রাইকই (সেবন) উপকার সাধন করবে কিংবা Mag phos 6x (ম্যাগফস)-কে **নিম** গরম পানিতে মিশিয়ে অল্প অল্প করে বার বার খাওয়ালে ব্যথা দূরীভূত হবে। যেক্ষেত্রে ঠান্ডা সেঁকে প্রশান্তি লাভ হয় সেক্ষেত্রে একোনাইট আর বেলাডোনা কার্যকর।

যদি আকস্মিক **আমাশার** সঙ্গে ভীতি ও আতঙ্কের লক্ষণ থাকে তাহলে এই আমাশায় একোনাইট তাৎক্ষণিক উপশম প্রদানে সক্ষম। **শুষ্ক গরমে** যে **আমাশা** দেখা দেয় -এ ক্ষেত্রে একোনাইট অতুলনীয়।

হৃদরোগের বেলাতেও একোনাইট বড়ই উপকারী। আমার মরহুম পিতা যিনি নিজেও একজন দক্ষ হোমিও চিকিৎসক ছিলেন তিনি হৃদরোগের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সময় একোনাইট আর ক্র্যাটাগাস মাদার টিংচার একত্রে মিশিয়ে দিতেন। একোনাইটের মাদার টিংচারকে ক্র্যাটাগাস মাদার টিংচারের সাথে মিশিয়ে টনিক বানানো হয়। আট দশ ফোঁটা ক্র্যাটাগাস-এর সাথে মাত্র এক কি দুই ফোঁটা একোনাইট পানিতে মিশিয়ে সেবন করলে আল্লাহ্‌র কৃপায় অনেক উপকার হয় একোনাইটের পরিমাণ বেশী হ'লে মারাত্মক ফলাফল দাঁড়াতে পারে তাই সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

যে রোগীর হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক হারে দ্রুত তার জন্য একোনাইট বড়ই উপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে গ্যাস সঞ্চিত হবার কারণে স্নায়বিক দুর্বলতা হেতু হৃৎপিন্ডের স্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে যায়। এর কারণে ঘুমও পায় না। যদি রোগী শঙ্কিত থাকে, কোন খারাপ সংবাদ শোনার পর উত্তেজিত হয় কিংবা পরীক্ষা দিতে যেতে হবে অথবা অন্য কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে- এসব কারণে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। একোনাইট ৩০ কিংবা ২০০ প্রয়োগ করলে হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে যায় আর স্বস্তি ফিরে পায়।

কিছু কিছু মানসিক রোগে একোনাইট কার্যকর। মানসিক আঘাত কিংবা নৈরাশ্যের কারণে অকস্মাৎ মস্তিষ্কে মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হলে যদি সব কিছুতেই রোগী বিনা কারণে শঙ্কা বোধ করে এরূপ রোগের সূচনায় একোনাইট প্রয়োগ করলে উল্লেখযোগ্য উপকার সাধিত হয়। কিন্তু রোগ যদি দীর্ঘায়িত হয়ে গিয়ে থাকে তবে অন্যান্য ঔষধ অনুসন্ধান করা উচিত যাদের মধ্যে সালফার উল্লেখযোগ্য। সালফারকে একোনাইটের Chronic রূপ বলা হয়। সালফারের যে সব লক্ষণাদি Chronic আকারে দেখা যায় একোনাইটে সেগুলিই অস্থায়ীরূপে দেখা দেয়।

দৈনন্দিন জীবনের এমন সব রোগ যা বাইরের জীবাণু আক্রমণে দেহে জন্ম নেয়-যেমন, বাসী বিষাক্ত খাবার খেয়ে ফেললে যদি দাস্ত আরম্ভ হয়ে যায় অথবা হঠাৎ করে যদি আমাশা আরম্ভ হয়ে যায়, একইভাবে বর্ষাকালে যদি রক্ত আমাশা আরম্ভ হয় যার কারণে রোগী ভীত হয়ে পড়ে -এসব ক্ষেত্রে একোনাইট কার্যকর সাব্যস্ত হতে পারে।

এমন কিছু রোগ আছে যার কারণে রোগী **আতঙ্কে চিৎকার আরম্ভ করে দেয় আর তার মাথা ঘুরায়**। ধরুন, পথে হাঁটতে হাঁটতে অকস্মাৎ কুকুর আক্রমণ করে বসলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে যায় আর তার মাথা ঘুরায় এমতাবস্থায় একোনাইট তাৎক্ষণিক উপকার সাধন করে।

যদি হঠাৎ করে চোখের মধ্যে প্রদাহ দেখা দেয় তাহলে একোনাইট আর বেলাডোনাকে এক সাথে মনে রাখতে হবে। বিস্তারিত লক্ষণাদি প্রকাশিত হবার অপেক্ষা না করে এই দুই ঔষধ একত্রে ব্যবহার করা উচিত। কেননা, এদের একটি অপরটিকে সাহায্য করে। তবে যদি কোন একটি ঔষধের লক্ষণাদি এতই স্পষ্ট হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়টি দেয়ার প্রয়োজন নেই। ধরুন, বেলাডোনার লক্ষণাদি বড়ই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হ'লে সেক্ষেত্রে একোনাইট একত্রে প্রয়োগ করার দরকার নেই। সেক্ষেত্রে এটা একাই রোগকে বাগে আনতে সক্ষম হবে আর এর প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ঠান্ডা লেগে যদি হঠাৎ **কানে প্রচন্ড ব্যথা** দেখা দেয় তাহলে একোনাইট তাৎক্ষণিক উপশমের কারণ হয়। একোনাইটের ব্যথার স্থানে স্পন্দনের অনুভূতি থাকে আর রোগী উপশব্দ আর বাজনার শব্দ সহ্য করতে পারে না।

একোনাইটের একটি বৈশিষ্ট্য পালসটিলার অনুরূপ। এতে জ্বর বা পীড়ার প্রভাব মুখমন্ডলের একাংশে পরিলক্ষিত হয়ে। রোগীর একটি গাল লাল হয়ে যায় অপরটি ফ্যাকাশে থাকে। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়। একেবারে সূচনাতে ঔষধ প্রয়োগ করতে পারলে রোগটি গোড়াতেই শেষ হয়ে যায়। বিলম্ব ঘটলে পালসেটিলা, লাইকোপডিয়ম বা নেটরাম মিউর সম্ভাব্য ঔষধ হতে পারে।

দাঁতে ঠান্ডা লেগে ব্যথা হলে কিংবা গলায় **ব্যথা হলে** একোনাইটের প্রয়োজন হবে। দেহের কোন অংশে যদি রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় আর সেই অংশ থেকে রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়, যেমন ঃ ধরুন, অন্ত্র থেকে রক্তপড়া আরম্ভ হলো- যেকোন কারণে হোক, যদি হঠাৎ হয়ে থাকে আর সেই সাথে রোগী আতঙ্কিত বোধ করে তবে নির্ভয়ে একোনাইট ব্যবহার করুন।

যদি মানসিক আঘাতের কারণে পেশাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অনতি বিলম্বে একোনাইট দিন। কোন আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ কিংবা কোন আর্থিক ক্ষতির কারণে মনে আঘাত লেগেছে এমতাবস্থায় একোনাইটের তাৎক্ষণিক ব্যবহার এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তি দান করে।

কোন কোন চিকিৎসকের ধারণা একোনাইট পুরুষদের চাইতে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর সাব্যস্ত হয়। যদি মেয়েদের দেহের অভ্যন্তরীণ পীড়ায় আর গর্ভাশয়ের প্রদাহ জাতীয় রোগের সূচনায় একোনাইট প্রদান করা হয় তাহলে আল্লাহ্‌র ফযলে সেই রোগ আর বাড়বে না।

একোনাইটের কষ্ট উন্মুক্ত বাতাস আর পরিবেশে কমে যায়। রাতে গরম কক্ষে অবস্থান করলে অথবা শুষ্ক আর ঠান্ডা বাতাস লাগলে কষ্ট বাড়ে।

অনুবাদ ঃ -মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

সহযোগী ঔষধ ঃ সালফার, কফিয়া,আর্নিকা, বেলাডোনা, ব্রাইওনিয়া, ফসফরাস, স্পঞ্জিয়া

প্রভাব বিনষ্টকারী ঃ নাক্স ভমিকা, সালফার

সেব্য পটেন্সী ঃ মাদার টিংচার কিংবা সাধারণত ৩০, ২০০, ১০০০ বা CM অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক নির্ধারণ করবেন।

ওয়াকফে নও ও তাদের অভিভাবকদের জ্ঞাতব্য

কেন্দ্রীয় আতফালুল আহমদীয়া তাদের দেশীয় ইজতেমা করতে যাচ্ছে ১২ থেকে ১৯ জানুয়ারী,২০০১। এর সাথে ওয়াকফে নওদেরও ইজতেমা হবে। এতে সকল ওয়াকফে নও যেন আসেন এবং বিশেষ করে ৯ বছরের উপরে আতফাল ওয়াকফে নওকে অবশ্যই আসতে হবে। 'মূল্যায়নের ফরম' পূরণ করা হবে। Carrer Planning কমিটি আতফাল ওয়াকফে নওদেরকে Interview নিবে। সুতরাং ইহাকে অতীব জরুরী মনে করে অবশ্যই আসবেন অথবা ওয়াকফে নওদের পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

আমাদের চাঁদা

(তৃতীয় কিস্তি)

সময় থাকতে আল্লাহ্‌র হক্ আদায় করা দরকার ঃ

উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের আয়ত্তে যে সকল উপকরণ রয়েছে তা বিনিয়োগ করে থাকি যেমন অর্থ, শ্রম, কাঁচামাল, পরিচালনা ইত্যাদি। কিন্তু এমন কতগুলো উপকরণ আমরা প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকি যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে মহান আল্লাহ্‌তাআলার দান। যেগুলোর উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন পানি, বায়ু সূর্যের আলো, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলার একটা অংশ স্বাভাবিকভাবেই নিহিত থাকে। আল্লাহ্‌তাআলা গনী অর্থাৎ অভাবমুক্ত তাই তাঁর নিজ প্রয়োজনে কিছুরই দরকার হয় না। তাঁর অংশ তিনি তাঁর পথে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের পরিকল্পনা মোতাবেক খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আমরা আল্লাহ্‌র হক্ সময় মত আদায় না করি তাহলে আমাদেরকে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর সময় মত কাজ না করলে তদ্বারা আশান্বিত ফলও লাভ করা যায় না। আল্লাহ্‌তাআলা সময় মত তাঁর রাস্তায় খরচ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন ঃ

(ক)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٥﴾

অর্থাৎ "হে যারা ঈমান এনেছ ! আমরা তোমাদেরকে যে রিয্‌ক (জীবনোপকরণ) দিয়েছি তাথেকে খরচ কর সেদিন আসবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ চলবে না, আসলে কাফিররাই যালিম" (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ২৫৫ আয়াত)।

(খ)

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

অর্থাৎ এবং তোমাদের কারও ওপরে মৃত্যু আসার "পূর্বে আমরা তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমরা তাথেকে খরচ কর অন্যথায় মৃত্যু আসলে ইহা যেন বলতে না হয়, হে আমার প্রভু ! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে না যাতে আমি সদকা (আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ) করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন আসবে আল্লাহ্ কখনও তাকে অবকাশ দিবেন না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত" (সূরাতুল মুনাফিকূন ঃ ১১-১২ আয়াত)।

আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার ভবিষ্যত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় এবং সন্তান-সন্ততির আরাম-আয়েশের জন্য আল্লাহ্‌র হক্ না দিয়ে ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ে গেলে সেই অন্তিম মুহূতে আমাদের কী করুণ অবস্থা হবে এবং ঐ ধন-সম্পদ আমাদের কী কাজে আসবে! হায় আফসোস করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না !

সূরাতুল কাওসারের প্রতি এক পলক ঃ

আল্লাহ্‌তাআলা সূরাতুল কাওসারে আঁ হযরত (সঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন- "নিশ্চয় আমরা তোমাকে কাওসার দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর, নিশ্চয় তোমার শত্রু অপুত্রক।" কাওসার 'কাসীর' শব্দ থেকে উদ্ভূত, অর্থ আধিক্য। আল্লাহ্‌তাআলা রসূল করীম (সঃ)-কে প্রভূত কল্যাণ দিয়েছেন। সুতরাং উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবং উহাকে চিরস্থায়ী করার জন্য নামায-দোয়া তাসবীহ্-তাহমীদ ইত্যাদির সাথে কুরবানী করার তাগিদও করা হয়েছে এবং এই আশ্বাসও দেয়া হয়েছে যে, যদি ইহা করা হয় তাহলে-তাকে প্রদত্ত কল্যাণ চিরস্থায়ী হবে, বরকতমন্ডিত হবে, যা কোন দিন নিঃশেষিত হবে না। আল্লাহ্‌তাআলা যে জিনিসকে বরকতমন্ডিত করেন তা নিঃশেষিত হয় না। এর উদাহরণ আমরা পাই গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারের মধ্যে। আমরা এত জবাই করি তবু আমাদের গৃহ বোঝাই থাকে। আর এগুলো সাধারণতঃ অন্যান্য পশুদের তুলনায় বাচ্চাও দেয় কম। কিন্তু শূকর, কুকুর এরা অনেক বাচ্চা দিলেও তাদের বেশী দেখা যায় না। কেননা আল্লাহ্‌তাআলা এদের মধ্যে বরকত দেন নি। আল্লাহ্‌তাআলা যাকে আধিক্য দান করেন সে সৌভাগ্যশালী –এ দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। সুতরাং একথা জোর করেই বলা যায় যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতকে চিরস্থায়ী করার জন্য কুরবানী করতে হবে তা জীবনই হোক আর ধন-সম্পদই হোক। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার বদৌলতে আজ প্রায় ৪৫০০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে তিনি মানবের মধ্যে জীবিত থাকবেন। আমাদের ঈমানের দৌলতকে জীবিত রাখতে হলেও আমাদেরকে কুরবানীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

আল্লাহ্‌তাআলার বরকতের মাত্রা কী ?

আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করলে আল্লাহ্ আধিক্য দান করেন তা আমরা উপরে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, এই আধিক্যের কোন মাত্রা আছে কি? আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ২৬২ আয়াতে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই আধিক্যের মাত্রার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾

অর্থাৎ "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্য-বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্য বীজ থাকে, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন, বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।"

সুতরাং এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ্‌র প্রতিদানের মাত্রা ৭ শ' গুণ এমনকি আল্লাহ্ যাকে চান আরও বাড়িয়ে দেন। কিন্তু এসব কিছুর স্থলে থাকতে হবে আমাদের ঈমান বিল গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যে বিশ্বাস। বিশ্বাস করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং এই অদৃশ্যে বিশ্বাস ইসলামের অন্যতম মৌলিক কথা। আমরা দুনিয়ার কাজ-কর্মেও সর্বদাই অদৃশ্যে বিশ্বাস করে থাকি। অদৃশ্যে বিশ্বাস না থাকলে কি কোন কৃষক বেশী পাওয়ার আশায় বীজতলার পানির মধ্যে কতগুলো ধান ফেলে দিতে পারতেন ? কোন লোক গাড়ী চেপে নির্বিঘ্নে বসে থাকতে পারতেন চালকের প্রতি বিশ্বাস রেখে যে, সে তাকে গন্তব্য স্থলে পৌছে দেবেই ? কোন রোগী ভাল হয়ে উঠার জন্যে তাকে কি নির্বিঘ্নে সঁপে দিতে পারতেন ডাক্তারের চক্‌চকে ধারাল ছুরির নিচে ? তাই বিশ্বাসই জীবন, বিশ্বাস ব্যতিরেকে নৈরাজ্যের অন্ধকারে হাবুডুব খেয়ে একুল ওকুল দু'কুলই হারাতে হয়।

মালী কুরবানীতে আঁ হযরত (সঃ)-এর আদর্শ ঃ

যদিও খুবই দারিদ্র্যের অবস্থার মধ্য দিয়ে সরওয়ারে কায়েনাত ফখ্রে মওযুদাত হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর জীবনের উন্মেষ ঘটেছিল এবং সারা জীবন দারিদ্র্যের সাথে তিনি পাঞ্জা লড়েছিলেন; তথাপি তিনি, সাধারণতঃ যেভাবে মনে করা হয়, নিঃস্ব ছিলেন না। তিনি মালিক হয়েছিলেন প্রচুর সম্পদের এবং বিলিয়েছিলেনও অকাতরে প্রচুর। তাঁর পবিত্র জীবনী পাঠক মাত্রই অবহিত হবেন যে, কীভাবে তিনি বিদ্যুৎগতিতে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিলিয়েছিলেন এত, যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেন তার আগের রাত্রে তাঁর ঘরে বাতি দিবার মত কেরোসিনও ছিল না। আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবাবৃন্দও তাঁকে পদে পদে অনুসরণ করতেন। নবী করীম (সঃ) মালী কুরবানী সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যেসব পবিত্র কথা বলেছেন এর ২/১টি হাদীস উদ্ধৃত করছি ঃ

(ক) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন–"এমন কোন বান্দা নেই যে প্রভাতে উঠলে তার নিকট দু'জন ফিরিশ্‌তা না আসে। একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্ যে খরচ করে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) তার প্রতিদান তাকে দান কর। অপরজন বলতে থাকে, হে আল্লাহ্ কৃপণকে ধ্বংস করে দাও" (বুখারী ও মুসলিম, বাবুল ইনফাক)।

(খ) হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন – "মহান আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদম সন্তান! খরচ কর (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) তোমার জন্য খরচ করা হবে" (বুখারী ও মুসলিম, বাবুল ইনফাক)।

(গ) হযরত উকবাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পিছনে আসরের নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে লোকজনের কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর স্ত্রীর ঘরে গেলেন। লোকজন তাঁর ব্যস্ততা দেখে ভয় পেয়ে গেল। কতক্ষণ পর রসূল (সঃ) তাঁদের নিকট এসে দেখলেন তারা তাঁর ব্যস্ততায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তখন তিনি বল্লেন, "আমার একখন্ড স্বর্ণ আছে, আমার মনে হ'ল। এটা আমাকে আবদ্ধ রাখুক তা আমি পসন্দ করি না। সুতরাং তা বন্টন করার আদেশ দিয়ে এলাম" (বুখারী)।

তাবূকের জিহাদের সময় আঁ হযরত (সঃ) আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানালেন, সাহাবায়ে কেরাম যাঁর যাঁর সঙ্গতি অনুযায়ী কুরবানী হুযূরের (সঃ) খিদমতে পেশ করলেন। হযরত আবূবকর (রাঃ) দিলেন তাঁর যা ছিল সব। হযরত উমর (রাঃ) দিলেন তাঁর যা ছিল তার অর্ধেক। হযরত আবূবকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, তিনি তাঁর ঘরে কী রেখে এসেছেন। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে। এই ছিল তাঁদের ত্যাগ, যার ভিত্তি ছিল সুকঠিন ঈমানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের এই ত্যাগের বদৌলতেই পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদেরকে খিলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। তাঁরা কখনও মনে করেন নি, আজ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে কাল তাদের বা বংশধরদের কী হবে?

আহমদীয়া জামাতের সফলতার চাবিকাঠি ঃ

মহান আল্লাহ্‌তাআলা সূরা সাফ্‌ফ এর মধ্যে যে আয়াতে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছেন তার পরবর্তী আয়াতেই বিজয়ের চাবিকাঠি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থাৎ "(তা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপরে ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে, ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানতে" (সূরা সাফ্‌ফ ঃ ১২)। সুতরাং মালী কুরবানীই জামাতে আহ্‌মদীয়ার তথা ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের চাবিকাঠি। জামাতের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) তাঁর জামাতকে বিভিন্ন লেখা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে মালী কুরবানীর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জামাতের চাঁদা দানকে প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি তবলীগে রেসালত পুস্তকের ১০ম খন্ডের ৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে বলেছেন, "ঐ সমস্ত লোকের সংগেই আমার যোগাযোগ আছে অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোকই আমার অনুসারী যারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করায় ব্যস্ত থাকে। তিনি আবার লিখেছেন, প্রত্যেক আহমদীর নিজের উপর মাসিক চাঁদা ধার্য করা উচিত তা এক পয়সা বা আধা পয়সাই হোক না কেন এবং যে কিছুই ধার্য করেন না সে মুনাফিক, সে সিলসিলায় থাকতে পারে না'। তিনি আবার লিখেছেন, "চাঁদার ওয়াদা করে যদি কেউ তিন মাস পর্যন্ত চাঁদা দানে অবহেলা দেখায় তার নাম আহমদীয়তের খাতা থেকে কেটে দেয়া হবে।"

তিনি বলেছেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে অর্থ ব্যয় করে তবে অপরের তুলনায় অধিক আশীষপ্রদ হবে, কেননা অর্থ আপনা-আপনি আসে না বরং খোদার ইচ্ছায় আসে। তোমরা ভেব না যে তোমরা তোমাদের অর্থের একাংশ দিয়ে বা অন্য কোন প্রকারের খিদমত করে খোদাতাআলা বা তাঁর প্রেরিত-পুরুষকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছ বরং তিনি তোমাদেরকে যে খিদমতের জন্য ডাকেন সে জন্যে তোমাদেরই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আমি সত্য সত্যই বলছি, যদি তোমরা সকলে আমাকে বর্জন কর এবং খোদার পথে সাহায্য দান থেকে বিরত থাক তবে তিনি এক নতুন জাতিকে দাঁড় করবেন যারা তাঁর সেবা করবে। তোমরা নিশ্চয় জান, এ কাজ স্বর্গীয় এবং তোমাদের খিদমত শুধু তোমাদের মঙ্গলের জন্যে। সুতরাং তোমরা যেন কোন প্রকার অহংকার না কর। একথা মনে কর না যে, তোমরা আর্থিক কুরবানী কর খোদার প্রয়োজনে। আমি বার বার বলছি, খোদাতাআলার তোমাদের খিদমতের কোন প্রয়োজন নেই, তবে হ্যাঁ, তিনি তোমাদের খিদমতের সুযোগ দান করেন এটা তাঁর অনুগ্রহ।"

হুযূর (আঃ) অন্য জায়গায় বলেছে, "যারা উপস্থিত আছ বা অনুপস্থিত আছ তোমাদের ভাইদিগকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করে দিবে এবং দুর্বল ভাইকেও চাঁদায় শরীক করবে, এই সুযোগ আর আসবে না। এ যুগ এরূপ আশীষপূর্ণ যে কারও প্রাণ চাওয়া হয় না এবং এ যুগ প্রাণ দেবার নয় বরং শক্তি অনুসারে অর্থ ব্যয় করার যুগ।"

বন্ধুগণ অবগত আছেন, ইসলামকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠাকল্পে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন হয়েছে আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতিবিম্বরূপে। হাদীসে আছে, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন অর্থাৎ তিনি কলমের জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের জামালী (সৌন্দর্য বিকাশক) রং দুনিয়াতে পেশ করবেন। উত্তেজনার মুহূর্তে জীবন দিয়ে শহীদ হওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয় এবং প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক মুসলমানকে তার জন্যে প্রস্তুতও থাকতে হবে, কিন্তু এই যুগ তেমন জীবন দেয়ার জন্যে নয়, এ যুগে পলে পলে রক্ত বিন্দু দিয়ে ইসলামের খিদমত করতে হবে। তবেই দুনিয়াতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে অন্যায় ও অসত্যের উপর

এবং দুনিয়াতে খোদার প্রতিশ্রুত শান্তিরাজ্য কায়েম হবে। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই প্রয়োজন আর্থিক কুরবানীর। কিন্তু অনেক বন্ধু এমন আছেন যারা অনেক বুঝে-শুনেও রীতিমত আর্থিক কুরবানী করেন না। শয়তান তাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়, সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তার ধোঁকা দেয়। তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ফত্হে ইসলাম পুস্তকে লিখেছেন, **"সেই লোকদের জন্যে আফসোস-যাদের নিকট নিজেদের স্ত্রী, সন্তান ও ভোগ-বিলাসের জন্যে সব কিছু থাকে কিন্তু ইসলামের জন্য তাদের পকেটে কিছু থাকে না।"**

যামানার ইমামের আহ্বানে সারা দিয়ে আজ সমগ্র পৃথিবীতে আহ্মদীরা অকাতরে মালী (আর্থিক) কুরবানী করছে যার ফলে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ১৭০টি দেশে ইসলামের বাণী পৌঁছে গেছে। আজ সমগ্র জামাতের বাজেট কয়েক শ' কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। যথা-সম্ভব কুরআন, হাদীস এবং যুগ-ইমামের মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী আপনাদের সামনে পেশ করলাম। এথেকে একটা কথাই আমাদের নিকট পরিষ্কার হয় যে, **সত্যিকার ঈমানদার দাবী করতে হলে সর্বদা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আর্থিক কুরবানীর জন্যে তৎপর থাকতে হবে।**

আমরা যুগ-ইমামের হাতে হাত রেখে এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, "ম্যায় দীন কো দুনিয়া পর মোকাদ্দম রাক্‌খুঙ্গা" অর্থাৎ আমরা ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিব। কিন্তু সত্যিকারভাবে আমরা তা কতটুকু করেছি সে জন্য আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ধর্মকে 'মোকাদ্দম' রাখতে হ'লে জানতে হবে ধর্ম আমাদের নিকট কি চায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষায় বলতে গেলে হয়, **"ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট থেকে এক প্রায়শ্চিত চায় । তা কী? তা হলো এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যুর উপর ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে"** (ফত্হে ইসলাম)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, **"খোদাতাআলা এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করার সময় আমাকে বলেছেন, পৃথিবীতে যালালত বা পথ-ভ্রষ্টতার ঝড় উঠেছে। তুমি এই ঝড়ের সময় এই কিশ্‌তি বা তরী প্রস্তুত কর। যে ব্যক্তি এই কিশ্‌তিতে আরোহণ করবে সে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে তার জন্য মৃত্যু সমুপস্থিত।"**

বন্ধুগণ! আমরা যুগ-ইমামের হাতে হাত রেখে যে ওয়াদা করেছি যদি তা সঠিকভাবে পালন না করি তা হলে আকাশে আমরা তাঁর শিষ্যমন্ডলীভুক্ত বলে পরিচিত হ'তে পারব না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ঈমান আনার পরও যদি আমরা তাঁর কিশ্‌তিতে স্থান না পাই তবে আমাদের আফসোসের অন্ত থাকবে না। আসুন আজ থেকে আমরা আমাদের সর্ব প্রকার শিথিলতা পরিত্যাগ করে আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হই। আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাদেরকে তৌফীক দান করুন, আমীন।

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিটি সদস্যকে বয়াত করার সময় এই অঙ্গীকার করতে হয় যে, সে ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করবে এবং নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা ধর্মের সেবা করবে। সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রত্যেক আহমদী জামাতের প্রয়োজনের সময়ে জামাতের হাতে প্রয়োজনীয় রসদের যোগান দিতে নিজের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে চেষ্টা করবে। জামাতের প্রয়োজনের গুরুত উপলব্ধি করার জন্য যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর মুখ নিঃসৃত পুনরায় কয়েকটি বাণী আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

ক) "ঐ সকল লোকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ আছে অর্থাৎ ঐ সকল লোকই আমার অনুসারী যারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করায় ব্যস্ত থাকে।"

খ) "প্রত্যেক আহমদীর উপর মাসিক চাঁদা ধার্য করা উচিত তা এক পয়সা বা আধ পয়সাই হোক না কেন এবং যে কিছুই ধার্য করে না সে মুনাফিক, সে সিলসিলায় থাকতে পারে না।"

গ) "চাঁদার ওয়াদা করে যদি কেউ তিন মাস পর্যন্ত চাঁদা দানে অবহেলা দেখায় তার নাম আহ্মদীয়তের খাতা থেকে কেটে দেয়া হবে" (তবলীগে রিসালত ঃ ১০ম খন্ড)।

ঘ) "যারা উপস্থিত আছ বা অনুপস্থিত, তোমাদের প্রত্যেককে আমি তাগিদ করছি যে, তোমাদের ভাইদিগকে চাঁদা সম্বন্ধে সাবধান করে দেবে এবং দুর্বল ভাইকেও চাঁদায় শরীক করবে। এই সুযোগ আর আসবে না। এই যুগ এরূপ আশিসপূর্ণ যে কারও প্রাণ চাওয়া হয় না এবং এ যুগ প্রাণ দেবার নয় বরং শক্তি অনুসারে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করার যুগ" (আল্ হাকাম ঃ ৭ম খন্ড)।

ঙ) "সেই লোকদের জন্য আফসোস! যাদের নিকট নিজেদের স্ত্রী-সন্তান ও ভোগ-বিলাসের জন্য সব কিছু থাকে কিন্তু ইসলামের জন্য তাদের পকেটে কিছু থাকে না" (ফত্হে ইসলাম পুস্তক)।

চ) "ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট থেকে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়, তা কী ? তা হোল এই পথে আমাদের 'মৃত্যু বরণ'। এই মৃত্যুর ওপরেই-ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে" (ফত্হে ইসলাম পুস্তক)।

ছ) "ইহা খিদমত করার সময় এর পর সেই সময় আগতপ্রায় যখন এই পথে পর্বত প্রমাণ স্বর্ণ ব্যয় করলেও এই সময়ের এক পয়সার সমান হবে না" (তবলীগে রিসালত ঃ ১০ম খন্ড)।

যুগ-ইমামের উপরোক্ত মূল্যবান বাণী আপনাদের খিদমতে পেশ করার পর আমি জামাতের বিভিন্ন চাঁদার একটি বিবরণ আপনাদের সামনে রাখব, কেননা চাঁদার শ্রেণী বিভাগ এবং বৈশিষ্ট্যাবলী না জানার কারণেও অনেকে এথেকে পিছনে পড়ে থাকেন ঃ

ফরয চাঁদা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, যেমন যাকাত। বাকী অন্যান্য চাঁদাসমূহ অবশ্য দেয় বা লাজেমী ও ঐচ্ছিক-কুরআন এবং হাদীসের ভিত্তিতে সময়ের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে যুগ-ইমাম এবং তাঁর খলীফাগণ নির্ধারণ করেন। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সব চাঁদার গুরুত্ব এক রকম না হলেও ইসলামের প্রয়োজনের তাগিদে এর কোনটার গুরুত্বই অস্বীকার করা যায় না। চাঁদাগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

যাকাত

ইসলামের রয়েছে পাঁচটি আরকান (স্তম্ভ)। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপরেঃ (১) এ সাক্ষ্য দেয়া-আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রসূলুহূ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযান মাসে রোযা রাখা আর (৫) বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা। সুতরাং এথেকে আমরা জানতে পারলাম যে, যাকাতের অবস্থান তৃতীয়। 'যাকাত' শব্দের অর্থ পবিত্রকরণ ও বর্ধিতকরণ। কুরআন মজীদে অসংখ্য স্থানে যাকাত আদায় ফরয (অবশ্য করণীয়) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে ও জামাতের বিভিন্ন পুস্তকাদিতেও রয়েছে।

যাকাতের গুরুত্ব ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে কুরআন বলে ঃ

১. وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾

অর্থাৎ, "আর তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও, জেনে রাখো যে, এ সকল লোকই (যারা যাকাত দিচ্ছে নিজেদের ধন-সম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করছে" (সূরাতুর রূম ঃ ৪০)।

২. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

অর্থাৎ, "তাদের ধন-সম্পদ থেকে তুমি সদকা গ্রহণ করো যেন এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার আর তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পার এবং তাদের জন্যে দোয়া কর। নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্যে শান্তিদায়ক। এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ "(সূরাতুত্ তাওবা ঃ ১০৩)।

৩. اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

অর্থাৎ, "সাদকাসমূহ (যাকাত) কেবল গরীব ও মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এবং তাদের জন্যে যাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করতে হয় এবং দাস মুক্তির জন্যে এবং ঋণগ্রস্তদের জন্যে আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী ও পথিকদের জন্যে–আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরাতুত্ তাওবা ঃ ৬০)।

উপরোক্ত কুরআনী নির্দেশে আমরা জানতে পারলাম যে, যাকাত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে উসুল করার জন্যে তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং ইহা বন্টনের পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে। যাকাত প্রসঙ্গে এখানে একটি দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন মনে করি। ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী যাকাতের পুরো অর্থ নবীর অবর্তমানে যুগ-খলীফার নিকট 'বায়তুল মালে' জমা হওয়া আবশ্যক। কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করলে তা যাকাত হবে না, তা হবে দান-খয়রাত। কোন দেশের স্থানীয় জামাত যাকাত উসুল করে কেন্দ্রে পাঠাবে এবং কেন্দ্রীয় জামাত খেলাফতের ব্যবস্থাপনার নির্দেশানুযায়ী যাকাত বন্টন করবে।

আল্লাহ্‌তাআলা কুরআনে যেখানেই নামাযের কথা বলেছেন সেখানেই যাকাতের কথা বলেছেন। ইসলামী নামাযের মধ্যে ইসলামী সমাজের চিত্র অংকন করা হয়েছে। এক নেতার পিছনে গোটা মু'মিন সমাজ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং তার সাথে রুকূ সিজদা করে। ইসলামী সমাজে এই শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও নামাযের একটি দিক আর সে লক্ষ্য অর্জিত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের আপামর জনগণের পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করা না যায় বা সমাজ থেকে দুঃখ-দারিদ দূর করা না যায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রবর্তিত হয়েছে 'যাকাত' ব্যবস্থা। আর তাই নামাযের সাথে সাথে যাকাতের কথা বলে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে পারবে না যদি সমাজের গোটা মানুষের মৌলিক চাহিদা-খাওয়া, পান করা, পরিধেয় এবং বাসস্থানের চাহিদা না মেটাতে পার। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যাকাত ইসলামী অনুশাসনের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীটি স্বচ্ছল ইসলামী পরিভাষায় সাহেবে নেসাব (যাঁদের কাছে সারা বৎসর সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা উহার মূল্য জমা থাকে) বলে। সাহেবে নেসাব ব্যক্তিবর্গ তাদের কাছে জমান সম্পদের উপর ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত প্রদান করবে। ভিন্ন ভিন্ন ধন-সম্পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যাকাতের হার নির্ধারিত রয়েছে (বিস্তারিত জানার জন্যে 'মাসালা যাকাত' এবং 'ইসলামী ইবাদত' পুস্তক পাঠ করা যেতে পারে)। আগেই বলেছি - ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যাকাত যুগ-ইমামের নিকট পৌছা আবশ্যক। নিজে নিজে ইহা বন্টন করা সঙ্গত নয়। তবে যদি কোন বন্ধু যাকাতের অর্থ নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করতে চান তবে নেযামের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। 'যাকাত' আদায় করার সময়ে যাদেরকে তিনি যাকাতের টাকা দিতে চান তাদের নাম জামাতের নিকট পেশ করা উচিত যাতে জামাত যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে।

যাকাত প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সাহেবে নেসাব ব্যক্তিগণ যাকাত আদায় না করে বহুগুণে অন্যান্য চাঁদাদি আদায় করলে তাতে যাকাতের শর্ত আদায় হবে না। কেননা যাকাত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয তাই তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী হয়ে থাকবেন। যাকাতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে এখানে এ কথা উল্লেখ করা অবাঞ্ছিত হবে না যে, হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পরে যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন হযরত আবূবকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন।

তাই যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথারীতি যাকাত আদায় করার জন্যে সংশ্লিষ্ট আহমদী ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যারা সাহেবে নেসাব হয়েছেন অথচ যাকাত আদায় করবেন না তাদেরকে আল্ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি-

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٥﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٦﴾

অর্থাৎ "আর যারা সোনা-রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না - তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন এগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং এগুলো দ্বারা তাদের কপালে, তাদের পার্শ্ব দেশে দাগ দেয়া হবে (আর তাদেরকে বলা হবে) ঃ এ সেই বস্তু যা তোমরা নিজেদের জন্যে মজুদ করতে, সুতরাং তোমরা যা মজুদ করতে (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ করো (সূরাতুত্ তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)।

এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ)-এর সতর্ক বাণীও স্মর্তব্য ঃ "যে সব ধনী ব্যক্তি নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে না তাদের ধন-সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা তাদের কপালে এবং মুখ-মণ্ডলে ছেঁকা দেয়া হবে এবং এই শাস্তির মেয়াদ ৫০ হাজার বছরের সমান হবে" (মিশকাত)। এ প্রসঙ্গে হাদীসে আরও অনেক সতর্ক বাণী রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, যাকাত আদায় করার উপযুক্ত সময় রমযান মাস। তাই অতি বিনয়ের সাথে **'সাহেবে নেসাব'** (যাদের উপর যাকাত প্রদান ফরয) বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। (চলবে)

– মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মাহে রমযানে রোযা রাখার অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পবিত্র মাহে রমযানের রোযা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। বিশেষ করে রোযা ইসলামী ইবাদতের তৃতীয় ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম 'রমযান'। আর এ মাসের পূর্ব নাম ছিলো নাতেক (কাদীর)। রমযান শব্দটি 'রময' মূল ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া। আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ-বিলাস হতে নিবৃত্ত থাকে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করার নিমিত্তে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্যে এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রময' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যদ্বারা পাথর প্রভৃতি পদার্থ উত্তপ্ত হয় (আল হাকাম ২৪/৭/১৯০১ইং দ্রঃ)। এক কথায় বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক এ উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণের নাম রোযা। দেহ ও আত্মার মিলিত সংযম সাধনার দ্বারা রোযাব্রত পালনে পরিপূর্ণতা আসে। মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং তাকওয়ামুখী পবিত্র জীবন নির্বাহের শিক্ষা দিতে এসেছে মাহে রমযান। এছাড়া রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের অনুপম সওগাত নিয়ে এসেছে রমযান। রমযান মাসের ইবাদতসমূহ মানুষের দেহ থেকে পুঞ্জীভূত সূক্ষ্ম পাপকে দূরীভূত করে। এ মাসের ইবাদতসমূহ কবুলিয়তের মর্যাদা রাখে। এ মাসে একনিষ্ঠ ইবাদত ও স্রষ্টার নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে পালনের ফলে মানবের হৃদয়ে দয়া ও ভালবাসার উদ্রেক হয়। রমযান মাসের সিয়াম সাধনা দৈহিক পরিশুদ্ধি ও আত্মিক ক্রমোন্নতি লাভেরই সুনিশ্চিত ঐশী ব্যবস্থা।

রোযা ব্রত পালন যুগে যুগে

'ইয়াআইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ কুতিবা আলায়কুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন কাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকূন।' অর্থ– 'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ হলো, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ (ফরয) করা হয়েছিলো যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো' (সূরা বাকারা ঃ ২৮৪ আয়াত)।

রোযা পালনের নির্দেশ কোন অভিনব ব্যাপার নয় এবং এতে কোনো সহ্যাতীত কষ্টও নেই। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রোযা (উপবাসব্রত) পালন কোনও না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। ইহুদীরা নবী মূসার (আঃ) পায়রবী ও অনুবর্তিতায় রোযা পালন করে। বাইবেলে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সে সময় মোশী [হযরত মূসা (আঃ)] চল্লিশ দিবারাত্র সেথা সদা প্রভুর সাথে অবস্থান করলেন, অন্নভোজন ও পানাহার করলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মের বাক্যগুলো অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখলেন" (যাত্রা পুস্তক ৩৪ঃ২৮)। ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ আছে ঃ তখন যীশু [হযরত ঈসা (আঃ)] দিয়াবল বা শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্যে, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হলেন। আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থেকে শেষে ক্ষুধিত হলেন" (মথি, ৪ঃ২-৩)।

এ উদ্ধৃতি থেকে জানা গেলো যে, খৃষ্টানরা নবী ঈসার (আঃ) আজ্ঞানুবর্তিতায় রোযা রাখতেন। মিশরীয়দের মধ্যেও রোযা পালনের ব্যবস্থা ছিলো।

হযরত নূহ (আঃ)ও রোযা রাখতেন (ইবনে মাজা)। নূহ (আঃ) নবীর পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। কারো কারো মতে তার উপরে ৩০টি রোযা ছিল। এভাবে হযরত দাউদ (আঃ) অর্ধ বছর রোযা রাখতেন (নাসায়ী)। বেদের অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও উপবাস থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। মহানবীর (সঃ) নবুওয়ত দাবীর পূর্বে আরবে মুশরিকদের মধ্যেও রোযার প্রচলন ছিল। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আশুরার দিনে কোরেশরা জাহেলী যুগে রোযা রাখতো এবং নবীজীও সে সময় রোযা রাখতেন। মদীনায় হিজরতের পরও রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রোযা রাখেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দেন। পরিশেষে রমযানের রোযা যখন ফরয হয় তখন তিনি আশুরার রোযা ছেড়ে দেন (বুখারী)। বস্তুত হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের জন্যে যে রোযার আদেশ ছিল সেই (সুন্নত মোতাবেক) রোযাব্রত পালনেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। "সভ্যতার নীচ, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায় নির্বিশেষে অধিকাংশ ধর্মেই উপবাসের বা রোযার প্রচলন রয়েছে। আর যেখানে এই ধরনের নির্দেশ নেই, সেখানেও প্রাকৃতিকে প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা দ্রঃ)।

রোযা পালনের উদ্দেশ্য

পবিত্র রমযান মাসে রোযা ব্রত পালনকারীদের কেবল উপবাস থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং উচিত সে যেন আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণে মশগুল থাকে। যাতে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌মুখী হওয়া যায়। রোযা পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে, যা কেবল দৈহিক ক্ষুধা নিবারণই করে, দ্বিতীয় রুটি বা খাদ্য লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। যারা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে রোযা রাখে এবং নিছক রুসুম হিসাবে রাখে না, তাদের উচিত আল্লাহ্‌তাআলার 'হামদ' (প্রশংসা), তসবীহ্ (গুণকীর্তন করা) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে নিমগ্ন থাকা যাতে তার অন্য খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়।

আমাদের দেহে নিত্য যে রূহানী বিষ সৃষ্টি হয় বা পাপ রাশি জমা হয় তা দূরীভূত করার জন্যে মহান আল্লাহ্‌তাআলা ঐশী ব্যবস্থা করেছেন। এবং বছরব্যাপী যে বিষ জমা হয় তা নিবারণের জন্যে আর একটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনন্দিন যে আত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি পাঁচ বেলা নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে রমযানে রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

রোযা না রাখার দরুন বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বৃদ্ধি পেতেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তি ক্রমশঃ আত্মিকভাবে নির্জীব ও দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। ফলে সে স্রষ্টাকে দৃষ্টিহীনতার কারণে চিনতে পারে না। যেভাবে দৃষ্টিহীন কোন ব্যক্তির সামনে তার অতি আপন জন দাঁড়ালেও সে তাকে দেখতে পায় না। রোযা রেখে আল্লাহ্‌র কোন ইহসান বা উপকার সাধন হয় না বরং রোযা পালনে মানুষেরই প্রভূত উপকার সাধন হয়। ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রোগীর জন্য কল্যাণকর। কাজেই এই পবিত্র মাসের কদর করা আমাদের কর্তব্য।

ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদরা বলেছেন, মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের নির্যাস বা সমষ্টি। আর তা হলো, রোযা রাখা, দ্বিতীয়তঃ ফরয নামায আদায়, রাতে জাগ্রত হয়ে নফল ইবাদতসমূহ (তারাবীহ, তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদি) আদায় করা এবং সকাতর প্রার্থনা করা। তৃতীয় মনোযোগ সহকারে কুরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন হওয়া। চতুর্থ দান খয়রাত করা এবং পঞ্চম প্রবৃত্তির বিপদাবলী হতে মুক্তি লাভের জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

রমযানের গুরুত্ব

পবিত্র রমযানের পূর্বে যে সকল অপরাধমূলক কর্মকান্ড এবং লোমহর্ষক হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, নারী অপহরণ ও মানবতা বিধ্বংসী কর্মকান্ড সংঘটিত হতো তা যদি রমযান মাসে আরো

ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয় তাহলে রমযান মাসের পবিত্রতা কীভাবেই বা রক্ষিত হবে তা ভেবে দেখা দরকার। আল্লাহ্‌তাআলার ঐ সকল পুণ্যবান বান্দা, যাদেরকে রমযান ছাড়া অন্যান্য সময় শয়তান বিভ্রান্ত করতো এবং অবাধ্য ও অহংকারী (জীন্) অর্থাৎ বড়ো লোকেরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা বিপথে চালিত করতো তারা মাহে রমযানের শুভ লগ্ন থেকেই ন্যায় ও সত্যের পথে ধাবিত হয়। এছাড়া সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেন এবং রোযাব্রত পালনের মাধ্যমে সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত হন। রোযাদারকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কেউ সীমা লংঘন করতে পারে। কেউ কঠোর ব্যবহার করবে। অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করতে পারে। কিন্তু রোযাদার ব্যক্তি কোনো বেহুদা কথা বলতে পারবে না। আমি রোযা রেখেছি এটুকুই শুধু বলা যাবে। রোযা ঢালস্বরূপ এ হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঢাল দ্বারা যেমন কেউ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে। ঠিক তেমনি নিজেকে সুরক্ষার জন্য এবং যাবতীয় কদাচারও পাপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য রোযা মু'মিনের জন্য ঢালস্বরূপ ও রক্ষা কবচ। রোযাদার ব্যক্তিকে গীবত, প্রতিহিংসা এবং নীতি বিগর্হিত যাবতীয় সব কর্মকান্ড থেকে অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে।

পবিত্র কুরআন ও রমযান

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ বলেন, রমযান সেই মাস যাতে কুরআন নাযেল হয়েছে। কুরআন যা মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (হকও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারীর) জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে' (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬ আয়াত)। এটা বলা হয়ে থাকে যে, মহিমান্বিত পবিত্র রমযানেই কুরআন নাযিল শুরু হয়। তবে প্রকৃত বা অধিক গভীর অর্থ হচ্ছে, রমযানের জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআনে যত বিষয় রয়েছে তা যেন রমযানের মুবারক মাসে পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই রমযান মাসে যারা কুরআনের উপর সঠিকভাবে আমল করবে তাহলে রমযান মাস ও তাদের জন্য আলোক ধারায় উদ্ভাসিত হবে। মানুষের জন্য হেদায়াত **'ওয়া বাইয়্যেনাতিম মিনাল হুদা'** কেবল সাধারণ হেদায়াতই নয় বরং এমন হেদায়াত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সুস্পষ্ট এবং আলো বিকিরণকারী। মানুষের হেদায়াত ও পরিত্রাণের স্বর্ণালী সূত্র কুরআনেই বিধৃত রয়েছে। বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা মহানবী (সঃ) বলেছেন, রমযান ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে খোদা, আমি তাকে পানাহার এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছি। এই জন্য তুমি তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি এবং তাকে ঘুমাতে দেই নি এই কারণে তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে (বায়হাকী)। মানুষের আত্মিক অগ্রগতি ও চিন্তা শক্তির প্রখরতা এবং বুদ্ধি দীপ্ততার জন্য কুরআন মজীদ অর্থসহ পাঠ করা অত্যাবশ্যক। যাতে দুর্বল মানব শয়তানী শক্তির খপ্পর ও প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে। সুনিয়ন্ত্রিত খাবার যেমন দেহকে সবল রাখে, তেমনি ঐশী নিয়ন্ত্রিত পথে রোযা পালন আত্মাকে উন্নত, সবল ও উর্ধ্বগামী করে। মাহে রমযানের পুণ্যময় দিবসগুলো বড়ই বরকতপূর্ণ।

এ মাসে দোয়ার কবুলিয়ত এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভ

আল্লাহ্ বলেন, "এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বলো) আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই। যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয় (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭ আয়াত)। মহান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে রোযা রাখলে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দার ডাকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সাড়া দিয়ে থাকেন। ঐশী নির্দেশের অনুশীলনে বিগলিত চিত্তে দোয়া করলে বিপদাবলীর মেঘমালা অন্তর্হিত হয়ে যায়।

রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

'সিয়াম' শব্দের অর্থ বিরত থাকা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যাবতীয় পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ থেকে সূর্য উদয়ের (সুবহে সাদেক) পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়্যতে বিরত থাকার নাম সিয়াম। যে ব্যক্তি রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করে, তাকে অবশ্যই রোযা রাখার নিয়্যত বা সংকল্প করা উচিত। হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পূর্বে রোযার নিয়্যত করে না তার জন্য কোনো রোযা নেই" (তিরমিযী)। মহানবী (সঃ) বলেছেন, **' ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়ত'** অর্থাৎ কর্মসমূহ মানুষের নিয়্যত ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। নিয়্যত আসলে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ও মনের সংকল্প।

রমযানের রোযা প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সুস্থদেহী, মুকীম (ভ্রমণের অবস্থায় নয়, বাড়ীতে আছেন এমন ব্যক্তি) মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্য অবশ্য পালনীয়। ভ্রমণকারী, শিশু, মুমূর্ষু রোগী, পাগল, সদ্য প্রসূতি, গর্ভবতী নর-নারীর জন্য রোযার বিধান শিথিল করা হয়েছে। কুরআন বলেছে, **'ফামান কানা মিনকুম মারীযান আওআলা সাফারিন ফাইদ্দাতুম্মিন আইয়ামিন উখার-ওয়া আলাল্লাযীনা ইয়ুতীকুনাহূ ফিদইয়াতুন তায়ামু মিসকীন'** অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত থাকে বা সফরে থাকে তাহলে তাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে এবং যাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত তাদের উপর ফিদিয়া -এক মিসকীনকে আহার্য দান করা' (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫ আয়াত)। যারা পীড়িত এবং মুসাফির তারা রমযান মাসে রোযা রাখবে না বরং সফর শেষ হলে আর আরোগ্য লাভ করলে অন্য সময় রোযাগুলো রাখবে।

মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'সফরে পবিত্র লোকের রোযা নেই' (বুখারী, মুসলিম)। 'যে সফরে রোযা রাখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আবাসে রোযা রাখে না' (মুসলিম)। কোন কোন হাদীস পাঠে জানা যায় যে, নবী করীম (সঃ) কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফরে রোযা পালনকে ঐচ্ছিক বিষয় বলে বর্ণনা করেছেন' (বুখারী, মুসলিম)।

ভ্রমণে মু'মিনের জন্য কোনো ফরয রোযা নেই। রোযার উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে অভ্যস্ত করা। আল্লাহ্‌র হুকুমে খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করতে হবে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে পানাহার বর্জন করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, –অনেকে রোযা রাখে কিন্তু তা নিছক উপবাস থাকা ছাড়া আর কিছু নয়।

ভুলবশতঃ যদি কেউ পেট ভরে খায় তার রোযা ভাঙ্গবে না (বুখারী, মুসলিম)। এক কথায়, ভুলক্রমে খাবার খেলেও রোযা ভাঙ্গে না। আবার ঐশী-নির্দেশনা মেনে অভুক্ত থাকলেও রোযা পালন হয় না। আসলে, রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র হুকুম তামিল করা।

রমযানের পবিত্রতা রক্ষার নামে বাড়াবাড়ি করা কারো উচিত নয়। রমযান মাসে বলপূর্বক হোটেল রেস্তঁরা বন্ধ করার নামে জেহাদী তান্ডব চালানো ঠিক নয়। কেননা, রোগী এবং মুসাফিরদের ধর্মীয় বিধানের শিথিলতার কথাটিও ভাবতে হবে। তাদের খাবারের বিষয়টি যেমন ভাবতে হবে, তেমনি হোটেলের গরীব কর্মচারীর কথাটিও বেমালুম ভুললে চলবে না। খাবার দোকান বাধ্য হয়ে বন্ধ করার ফলে কর্মচারীরা ঠিক মত বেতন পায় না।

হাদীসে বর্ণিত আছে, 'রোযাদারের সম্মুখে যদি কোনো ব্যক্তি খাবার খায় তাহলে যতক্ষণ ঐ ব্যক্তির খাওয়া শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের নামে পুণ্য সঞ্চিত হতে থাকে। ফিরিশ্‌তা ঐ রোযাদারের উপর আশীষ বর্ষণ করতে থাকেন' (তিরমিযী)। কাজেই হোটেল রেস্তঁরা বন্ধ করে জন জীবনে দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা সৃষ্টি করা এবং কাউকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

রাতের শেষ ভাগ বা প্রহরকে সেহরী বলা হয়। নবী করীম (সঃ) বলেন, আমাদের এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল শেষ রাতের খাওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে, 'হে মুসলমানগণ ! তোমরা সেহরী খাও, কারণ উহার মধ্যে বরকত (কল্যাণ) নিহিত রয়েছে' (বুখারী ও মুসলিম)। তোমরা সেহরী খাও যদি তা এক ঢোক পানি হয় (মেশকাত)। হযরত আনাস হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে সেহরী খেলাম পরে ফজর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, সেহরী ও ফযরের নামাযের মধ্যে কত সময়ের পার্থক্য থাকতো ? এতে হযরত যায়েদ (রাঃ) বল্লেন যে, কমপক্ষে (কুরআনের) ৫০টি আয়াত পড়তে যতটুকু সময় লাগে (বুখারী, ইবনে মাজা)। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ আযান শুনে এবং খাওয়ার ও পান করার পাত্র তার হাতে থাকে সেক্ষেত্রে সে যেন পাত্র রেখে না দেয়। এমনকি যে, প্রয়োজন মত খেয়ে নেয় (আবূ দাউদ)। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা হতে পৃথক দৃষ্টি গোচর হয়' (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮)।

'ইফতার' আরবী শব্দ যার অর্থ ভঙ্গ করা। নির্দিষ্ট সময় থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শরীয়তসম্মত উপায়ে রোযা রেখে যথাসময়ে ভেঙ্গে ফেলাকে ইফতার বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তখন ইফতার করবে' (বুখারী, কিতাবুস সওম)। হযরত সুহায়েল বিন সাআদ (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মানুষ যতদিন (সময় মত) শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন কল্যাণ ও মঙ্গলই লাভ করতে থাকবে (বুখারী, কিতাবুস সওম)। ইসলাম ধর্ম ততদিন পর্যন্ত সুদৃঢ় থাকবে যতদিন পর্যন্ত লোকেরা (সঠিক সময়) তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহুদীও খৃষ্টানরা রোযা (সময় পার হয়ে গেলেও) দেরীতে রোযা ভাঙতো (আবূ দাউদ)। রসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করায় সে-ও অনুরূপ পুণ্য লাভ করে। অথচ, রোযাদারের পুণ্য কোনো অংশে কমে যায় না (তিরমিযী)।

রমযান মাসে রোযাব্রত পালনকালীন সময়ে স্বামী - স্ত্রী দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন থেকে নিবৃত্ত থাকতে হয়। কিন্তু ইফতার বা রোযা ভঙ্গের পর রাত্রে স্ত্রী গমন বৈধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, 'রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য এক প্রকারের পোশাক' (২ঃ১৮৮)। বলা হয়েছে, 'তোমরা মসজিদ সমূহে যখন ইতিকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করো না' (সূরা বাকারা ১৮৮ আয়াত)। নাপাক অবস্থায় ভোর হলে বা সেহরীর পরে গোসল করলে চলবে। তবে পাক পবিত্র হয়ে সেহরী খাওয়াই উত্তম। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রসূলকে ফজর ধরে (নিকটবর্তী) ফেলতো তখনো তিনি সহবাস-জনিত অবস্থায় (গোসলবিহীন) থাকতেন, অতঃপর (তড়িৎ) তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন (বুখারী)।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদাকে কুরআনে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো দম্পত্তির প্রশান্তি ও চোখের স্নিগ্ধতা লাভ, আত্মরক্ষণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা পোশাকের কাজ এই (৭ঃ২৭, ১৬ঃ৮২)। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণ নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মন্দ কর্ম ও কুৎসা হতে রক্ষা করা।

সত্য কথা বলার গুরুত্ব

রমযান মাসে রোযাদারদের সত্য বলার অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যে কথা এবং মিথ্যে কাজ পরিহার করে না এরূপ ব্যক্তির রোযা রেখে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকায় আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজন নেই" (বুখারী)। কষ্ট করে তার রোযা রাখা বৃথা। মিথ্যা বলা অত্যন্ত ঘৃণ্যতম কাজ যা একটি মানুষকে ইহলোকেই অবধারিতভাবে ব্যর্থতার তিক্ততা ভোগে বাধ্য করে থাকে এবং মৃত্যুর পরও যে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। সত্যবাদিতা অবলম্বন করুন, রপ্ত করুন এবং মিথ্যাকে বর্জন করুন। এছাড়া সকলের সাথে (কথা-বার্তায় এবং ব্যবহারে) সত্য কথা বলার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। নিজেদের স্বার্থে বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও মিথ্যার আশ্রয় নেয়া আদৌ উচিত নয়। মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সংগ্রাম একটি মহান জেহাদ। এই জেহাদে মু'মিনগণকে শামিল হতে হবে।

রমযানের তারাবীহ্'র নামায

রমযান মাসে ইশার নামযের পর তারাবীহ নামায পড়তে হয়। রমযানের চাঁদ আকাশে দৃষ্টি গোচর হলেই সেই রাত থেকে তারাবীহ নামায শেষ রমযান পর্যন্ত আদায় করতে হয়। ইশার নামাযের ফরয এবং সুন্নত আদায়ের পরই তারাবীহ নামায পড়তে হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রচলন করেন। ধারণা করা হয়, বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ে অসুবিধা বিধায় সকলের আরামজনক দিকে খেয়াল করে শুধু রমযানে ইশার নামাযের পর তারাবীহ'র নামাযের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে তারাবীহ নামায পড়ার পরও তাহাজ্জুদ নামায পড়া যায়। নামাযের রাকাআত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আবার সুন্নত না নফল এ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

সহী হাদীস দ্বারা রাত্রের নামায ২ রাকাআত করে ৮ রাকাত পড়ার কথা জানতে পারা যায়। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, মহানবী (সঃ) মাহে রমযানে ২ রাকাত করে ৮ রাকাআত এবং ৩ রাকাআত (বেতের) পড়েছেন (বুখারী)। হযরত খাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রমযান মাসে আমাদেরকে নিয়ে ৮ রাকাআত তারাবীহ্ ও বেতের নামায পড়ান। সায়ের বিন ইয়াজীদ বলেন, হযরত উমর ফারুক (রাঃ) উবাই বিন কাবও তামীমদারী দুই সাহাবীকে রমযান মাসে ১১ রাকাআত (তারাবীহ্) জামাত করে পড়বার হুকুম দিয়েছিলেন (মেশকাত)। ২০ রাকাআত তারাবীহ্ নামাযও অনেকেই পড়েন। ২০ রাকাআত নামায পড়ার পক্ষে যে দলীল পেশ করা হয় অনেকে তাকে যয়ীফ ও দুর্বল বলে মনে করেন। আমরা এই বিতর্কে না গিয়ে আসুন আল্লাহ্ এবং রসূল (সঃ) ও মহান খলীফা (রাঃ)-এর নির্দেশিত পথে ইবাদত বন্দেগীতে নিমগ্ন হই। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়াতে আছে, মহানবী (সঃ)-এর তিরোধানের পর থেকে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর যুগে এবং হযরত উমরের (রাঃ) যুগে প্রথমদিক পর্যন্ত কেউ কেউ বিনা জামাতে একা একা, কেউ শেষ রাতে, কেউ ঘরে, কেউ

মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে নফল নামায পড়তে থাকেন। এই অবস্থায় ঐক্য ও সংহতি এবং ইবাদতে একাগ্রতা সৃষ্টির লক্ষে হযরত উমর (রাঃ) রমযানে ইশার নামাযের পর সবার অংশ গ্রহণে একই পদ্ধতিতে তারাবীহর নামাযের ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি হযরত উবাই ইবনে কাবের ইমামতীতে জামাত সহকারে তারবীহ্ পড়ার হুকুম দেন। (তাবাকাতে ইবনে সাদ ৫ম, খন্ড, ৪২ পৃঃ)। সেই থেকে রমযান মাসে ইশার নমাযের পর তারাবীহ্ নামায পড়া হচ্ছে।

ই'তিকাফের গুরুত্ব

রমযানে শেষ দশকের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে একাধিক হাদীসে এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা ইহাকে (কুরআন) লায়লাতুল কদরে নাযেল করেছি।" বলা হয়েছে 'লায়লাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (সূরা আল্ কদর)। হযরত আবূযর গাফফারী বলেন, আমি নবীজীকে জিজ্ঞেস করলাম লায়লাতুল কদর রমযানের কোন তারিখে হয় ? তিনি বললেন, তোমরা ওকে রমযানের প্রথম ও শেষ দশকে অনুসন্ধান কর। আমি বললাম, ঐ দুই দশকের কোন দশক হবে। তিনি বললেন, ওকে তোমরা শেষ দশকে খোঁজ। এরপর আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না (সুনানে আহমদ)। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তোমরা লায়লাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতে তালাশ কর। যে ব্যক্তি ঐ রাতে ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের সব গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে (বায়হাকী)। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) রমযানের শেষ দশকে এত সাধ্য-সাধনা করতেন যে, অন্য সময়ে তা করতেন না (মুসলিম)। যখন রমাযানের শেষ দশক আসতো তখন তিনি নিজে রাত জেগে, ইবাদত করতেন এবং পরিবারবর্গকে ইবাদতের আদেশ দিতেন (বুখারী)।

রমযানের ২০ তারিখের পর থেকে দশ দিন ই'তিকাফ করা অবশ্য কর্তব্য। মসজিদে বসে কুরআন পাঠ করে সর্বক্ষণ নফল ইবাদতে মশগুল থাকতে হয়। নবী করীম (সঃ) ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুপম সওগাত নিয়ে এসেছে এই মাহে রমযান। তাই এই মাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সবাই আরো সংযমী হোন এবং স্রষ্টার প্রেমে বিভূষিত হয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার অভিযানে শামিল হোন। ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করে অশুভ শক্তিরা আজ উদ্যত ফনা তুলছে। তাই হক্ ও বাতিলের সংগ্রামে মু'মিনকে জয়ী হতেই হবে।

-আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র স্থানীয় মজলিসসমূহে নামায কায়েম সম্বন্ধে পালনীয় কর্মসূচী

১) প্রতি মাসের সুবিধাজনক কোন এক জুমুআ নামাযে ১০০% আনসারের উপস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত করে, প্রত্যেক মজলিস অবিলম্বে কার্যকর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২) প্রত্যেক মজলিসে যে আনসারগণ অর্থসহ নামায জানে না, তাদেরকে আগামী ৩১-১২-২০০০ তারিখের মধ্যে অর্থসহ নামায শিক্ষাদান সম্পন্ন করতে প্রত্যেক মজলিস জরুরী ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিবেন।

৩) আনসার সদস্য রয়েছেন এমন প্রতিটি পরিবার, যাদের পক্ষে মসজিদে বা নামাযের নির্ধারিত স্থানে যোগদান সম্ভব নয়, তারা নিজ গৃহে পরিবার-পরিজনসহ অন্ততঃ এক ওয়াক্তের নামায বা-জামাত আদায় করছেন এবং নামায শেষে সংক্ষিপ্ত দরস দিচ্ছেন- প্রত্যেক মজলিস সাংগঠনিকভাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে যথাবিহিত ব্যবস্থা নিবেন।

৪। আগামী জানুয়ারী -২০০১ মাসে প্রতিটি মজলিস "এ যুগে নামায কায়েমকারী জামাত-আহমদীয়া মুসলিম জামাত" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করবেন।

উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রত্যেক মজলিসের মুন্তাযেম তা'লীম ও মুন্তাযেম তরবীয়ত জরুরী ব্যবস্থা নিবেন।

রচনা প্রতিযোগিতা ঃ 'নামাযের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে আনসারুল্লাহর সদস্যগণের নিকট থেকে (১,০০০ শব্দের বেশী নয়) একটি প্রবন্ধ আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ১৫ই জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের মধ্যে ইহা খাকসারের নিকট পৌঁছাতে হবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিযোগিকে পুরস্কৃত করা হবে। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এগুলো 'আনসারুল্লাহ্' বুলেটিনে প্রকাশ করা হবে।

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে স্থানীয় যয়ীম/যয়ীমে আলা, জিলা নাযেম ও বিভাগীয় নাযেমগণ এবং সদর মুরব্বী মোয়াল্লেমগণকে পূর্ণ সহযোগিতা ও তদারকী করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, সদর
মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য
ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

মিনহাজুত্‌তালেবীন

(সত্য সাধকদের রাজপথ)

হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

২২তম কিস্তি

এখন আমি ঐসব খারাপ বিষয়াদি সম্বন্ধে বলছি যা অন্যান্য পশুর সাথে সম্পর্ক রাখে।

১। পশুকে বিনা কারণে প্রহার করা।

২। পশুদেরকে বেশী করে খাটিয়ে নেয়া।

এসব মন্দ কাজে কৃষকরা সাধারণতঃ জড়িত থাকে। তারা পশু দ্বারা কাজ নেয়। যখন তারা কাজ করতে অসমর্থ হয়ে যায় আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তখন কসাইদের কাছে বিক্রী করে দেয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, জবাই করা অবৈধ বরং আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, এমনভাবে কাজ নেয়া উচিত নয় যে, অতি পরিশ্রমে কাজের অযোগ্য হয়ে যায় - ইহা অবৈধ।

৩। পশুদেরকে খাবার কম দেয়া আর কাজ বেশী নিতে থাকা–এ খারাপ কাজে কৃষকরাই জড়িত থাকে না অন্যরাও থাকে। কৃষকদেরকে তো দেখা যায় যে, তারা নিজেরা না খেয়ে থাকে অথচ পশুদের চারা (পশুর খাদ্য) অবশ্যই যোগাড় করে থাকে। আমার কৃষকদের এ কথাটা খুবই ভাল লাগে - যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন তারা একথা বলে না যে, আমাদের খাবার কিছু নেই বরং বলে পশুদের খাবার নেই।

৪। অসুখ হলে পশুদের চিকিৎসা না করানো।

৫। পশুদের নির্যাতন করা ৬। দাগ দেয়া। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম একবার দেখলেন যে, একটি গাধার মুখে দাগ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এখানে দাগ লাগিও না, কেননা এ স্থানটি খুবই অনুভূতি- প্রবণ হয়ে থাকে। যদি দাগ দিতেই হয় তাহলে পিঠে দাও।

৬। পশুদের ঠান্ডা-গরমের প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।

৭। পশুদের যৌনাবেগের প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য।

মানুষের মত পশুদের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত। এজন্যে হয় তাদের যৌন-শক্তি দূর করার ব্যবস্থা না-ও নচেৎ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৮। সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া অর্থাৎ তাদের সামনে তাদের বাছুরদের জবাই করা বা ক্ষুধার্ত রাখা বা অন্য কোন পন্থায় দুঃখ দেয়া।

এখন আমি তৃতীয় প্রকারের মন্দ কাজ সম্বন্ধে বলবো যা জাতীয় পর্যায়ে করা হয়ে থাকে ঃ

১। যৌন চর্চা ও অশ্লীলতা প্রচার করা। যদি কোন ব্যক্তি লোকদের মধ্যেই ইহা বলে বেড়ায় যে, অমুক ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তাহলে ইহা অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত মন্দ কাজ নয় বরং জাতীয় পর্যায়ে মন্দ কাজ। কেননা, যে জাতির মধ্যে এ ঘোষণা হতে থাকে সে জাতির মধ্যে মিথ্যাবাদীও থাকে। উহার মধ্যে সততার মর্যাদা মিটে যেতে থাকে আর এর মধ্যে খারাবীর ব্যাপকতা লাভ হতে থাকে। অশ্লীলতা প্রচার আমার নিকট আত্ম-হত্যার শামিল।

২। স্বার্থপরতা। যখন জাতীয় কল্যাণের বিপরীতে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হয় তখন নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা আর জাতীর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া জাতীয় অকল্যাণ।

৩। দুষ্কৃতি ও অপরাধ। যেমন পতিতাদের ব্যবসা। আসর জমানো বা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মদ সেবন করা।

৪। জাতীয় কর্তব্য পালনে শিথিলতা প্রদর্শন।

৫। সন্তানদের চরিত্র গঠনের প্রতি মনোযোগ না দেয়া।

৬। সন্তানদের লেখা-পড়ার প্রতি দৃষ্টি না দেয়া। যেসব লোক এর প্রতি দৃষ্টি না দেয় সে জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। কেননা, সন্তানরাই জাতির ভবিষ্যত।

৭। নোংরা ময়লা। আগেও এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এজন্যে বলা হয়েছিলো যে, এতদ্দ্বারা লোকেরা দুর্গন্ধ পায় ও কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু এখানে এজন্যে বলা হচ্ছে যে, এতদ্দ্বারা রোগ-ব্যাধিও সৃষ্টি হয়। আর জাতির ধ্বংস ডেকে আনে।

৮। দায়িত্বের অনুভূতি হারিয়ে ফেলা। হারিয়ে ফেলা অর্থ হলো কোন জিনিষ থেকে বঞ্চিত থাকা। অর্থাৎ মানুষ ইহা অনুভব করে না যে, আমার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলো তা পালন করা আমার অবশ্য কর্তব্য ছিলো।

৯। কাজ ও দায়িত্ব পালন না করা এবং ক্ষতি হওয়ার প্রেক্ষিতে সহ্য না করা – ভুলে কাজ না করার বা জেনে-বুঝে করার কারণেই হোক না কেন।

১০। বিদ্রোহ।

এক বন্ধু একটি প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু আমি নিজেও এ প্রসঙ্গে বলতে চাচ্ছিলাম এজন্যে সুযোগ পেয়ে জবাব দিচ্ছি। ঐ বন্ধু জানতে চান, আমাদের জামাতকে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা বা মন্দ কথা প্রয়োগ করা উচিত নয়। তিনি আমাদের বক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন কঠোর ভাষা ব্যবহার না করা হয়। আমিও এ প্রসঙ্গে তাগিদ করছি। তারা আমার লেখায় কখনও এমন ভাষা দেখবেন না। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মন্দ বাক্য ও গালি-গালাজ শুনে আমার কি রাগ ওঠে না ? ওঠে, কিন্তু আমি কখনও কঠোর ভাষার পরিবর্তে কঠোর ভাষা ব্যবহার করি না। কতক লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতক লেখার উদ্ধৃতি দেয়। তাদের মনে রাখা উচিত হযরত সাহেব প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কারণে তিনি বিচারক ছিলেন। আর তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিলো যেন লোকদেরকে ওগুলোর আসল তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। কিন্তু আমাদের অবস্থান এরকম নয় এবং কঠোর ভাষা প্রয়োগ ও গালি-গালাজ করা দুর্বলতার লক্ষণ। আজকাল সম্ভবতঃ এতে কারও মনে তৃপ্তি হয় কিন্তু ভবিষ্যতে যে প্রজন্ম আসছে তারা যখন এসব লেখা পাঠ করবে তখন বলবে, হায়। আমাদের বাপ-দাদারা যদি এমনটি না করতেন। কেননা তারা ঠান্ডা মাথায় এ মতবাদ সম্বন্ধে পাঠ করবে। তারা রাগ হবে না। তাদের সম্মুখে বিরুদ্ধবাদীদের লেখাগুলো থাকবে না। ঐ সময় তারা এসব পুস্তকাদি ও পত্র-পত্রিকা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে যাতে কষ্টের ও কর্কষ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

১১। অতিথি সেবার প্রেরণা না থাকা। ইহাও জাতীয় অপকর্ম।

১২। ব্যবসায় ধোঁকাবাজী করাও জাতীয় অপকর্ম।

হাদীসে এসেছে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম উপদেশমূলক নির্দেশ দিতেন। একের পরে অন্য লোকেরা প্রশ্ন করা আরম্ভ করে দিলো। এতে তিনি আবেগপূর্ণ হলেন আর বল্লেন, করো যতো পারো প্রশ্ন করতে থাকো। আমি উপদেশ দেয়া বন্ধ করলাম। এখন যা জিজ্ঞেস করার করো। আমি কেয়ামত পর্যন্ত সব কথা বলে দিচ্ছি। এভাবেই আমিও বলছি, প্রশ্নের পরে প্রশ্ন আসছে। আমি কি বক্তৃতা বন্ধ করে প্রশ্নের উত্তর দেয়া আরম্ভ করবো? যে বিষয় আমি বলছি উহার নোটের এখন পর্যন্ত কেবল ৩৫ পৃষ্ঠার ওপরে বক্তব্য রেখেছি আর ২৫ পৃষ্ঠা অবশিষ্ট রয়েছে। যদি আমি প্রশ্নের উত্তর দেয়া আরম্ভ করে দিই তাহলে বিষয়টি কীভাবে শেষ হবে ?

আমি ইহা বলছিলাম যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধোঁকাবাজী করাও জাতীয় অপরাধ। কেননা এতদ্দ্বারা জাতীয় বিশ্বস্ততা ক্ষুণ্ন হয়। আমি যখন কাশ্মীর গেলাম তখন পর্যবেক্ষণ করেছি যে, রূপোর বাসন-কোসন ইত্যাদির ব্যবসায় যা কিনা এক কোটিতে ছিলো। লোকদের অবিশ্বস্ততার কারণে এখন কেবল ১৭ লক্ষে পৌছেছে। [যেভাবে বাংলাদেশের চিংড়ি মাছের ব্যবসায়ের অবস্থা দাঁড়িয়েছে – অনুবাদক]।

১৩। কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের সম্মুখে সমালোচনা করা।

১৪। কারও নাম না নিয়ে জাতির সাধারণ দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে ঘোষণা করা যেমন, এ রকম বলা যে, আমাদের মধ্যে অনেক ধোঁকাবাজ রয়েছে। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, ঐ জাতি এমনই হয়ে যায়।

১৫। জাতীয় উদ্দেশ্য পুরো করতে সাহায্য যোগাতে অনীহা দেখানো।

১৬। যেসব লোক দ্বারা ক্ষতি সাধিত হয় তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রাখা।

১৭। সরকারী ও জামাতী কর্মকর্তার সাথে সহযোগিতা না করা।

১৮। আনুগত্যের অভাব। (চলবে)

অনুবাদ –মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আগষ্ট ১-৩১, ২০০০

ইন্দোনেশিয়ার দর্শনীয় স্থান

ইন্দোনেশিয়া সফরের পর আতফালের সাথে প্রথম মুলাকাত অনুষ্ঠান (১৯শে জুলাই সম্প্রচারিত, ১২ই জুলাই ধারণকৃত)-এ হুযূর (আইঃ)-এর কাছে সেখানকার দর্শনীয় স্থান দেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, হুযূর (আইঃ) বলেন, দুই দিন বিশেষ করে বালি (Bali)-তে বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে। আমার কাছে খুব ভাল লাগে নি। তার মূল কারণ সেখানে মূর্তিপূজা খুব বেশী। রাস্তাঘাটে বাড়িতে সর্বত্র মূর্তিতে পরিপূর্ণ। এমনকি একবার দেখি আমার থাকার জন্য যে ঘর তাতেও (সাজ-সজ্জার অংশ হিসেবে -সংকলক) একটা মূর্তি। আর কেবল বিলাসিতার স্থান।

তবে আল্লাহ্‌র ফযলে ঐসব এলাকাতেও আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদও আছে। দূর-দূরান্ত থেকে নিষ্ঠাবান আহমদীরা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন।

কতক্ষণ ঘুমানো প্রয়োজন

একই অনুষ্ঠানে এক বালক কতক্ষণ ঘুমানো উচিত তা জানতে চাইলে হুযূর (আইঃ) বলেন, ছোটদের জন্য ৮/১০ ঘন্টাও ঠিক আছে এবং প্রয়োজন। বড় হলে এ চাহিদা কমতে থাকে। ডাক্তারগণ দিনের এক-তৃতীয়াংশের (অর্থাৎ আট ঘন্টার) কথা বলেন। তবে আমার ক্ষেত্রে আমি, মোটামুটি তিন ঘন্টা করে ঘুমাতাম। এটা বুঝানোর জন্যই বললাম যে, এত কম ঘুমিয়েও অনেক কাজ করা যায়।

ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্র

ইন্দোনেশিয়ায় জামাতের কেন্দ্র সম্পর্কে একই অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র ফযলে সেখানে ১৭ হাজার নামাযী নামায পড়তে পারেন। এটি রাজধানী জাকার্তা থেকে ৬০/৭০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইহুদী খ্রীষ্টান বাইবেল পড়লে পুণ্য হবে কিনা

ইহুদী খ্রীষ্টানগণ যখন বাইবেল পড়েন তখন তাদের পুণ্য হয় কিনা এক বালকের এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, তাদের মধ্যে যারা নেক প্রকৃতির তাদের হবে। কিন্তু, যারা বাইবেল পাঠ করে তা থেকে ভুল সিদ্ধান্ত বের করে তাদের হবে না।

প্রিয় সুগন্ধি

আরেক বালক হুযূর (আইঃ)-এর প্রিয় সুগন্ধি কি জানতে চাইলে হুযূর (আইঃ) বলেন, এগুলো আমি বলি না, নতুবা লোকে বহুল সংখ্যায় পাঠাতে শুরু করবে।

ইন্দোনেশিয়া সফরের সাফল্য

ইন্দোনেশিয়া সফর সার্বিকভাবে কেমন হ'ল এ প্রশ্ন এ অনুষ্ঠানেই করা হলে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্ সফল হয়েছে। সফরকালে পাঁচ হাজার বয়াত হয়েছে। আর ৭০/৮০ হাজার বা এক লাখ আহমদীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। এটা সেখানে না গেলে কখনো সম্ভব হত না।

বিভিন্ন স্থানে সফরের গুরুত্ব

হুযূর (আইঃ) বিভিন্ন স্থানে বেড়ানো প্রসঙ্গে এ অনুষ্ঠানেই এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কুরআনে পৃথিবীকে দেখার জন্য বেশি বেশি সফরের তাগিদ দেয়া হয়েছে। এতে জ্ঞান বাড়ে। আর লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে উত্তম উপসংহার বের করা উচিত। তবে কেবল বিলাস বা বিনোদনের জন্য সফর করা উচিত না।

মিনারাতুল মসীহ-র প্রথম মুয়ায্‌যিন

এক বালক মিনারাতুল মসীহ্‌তে প্রথম কে আযান দেন তা জানতে চাইলে হুযূর (আইঃ) বলেন, এটা জানা নেই। হুযূর (আইঃ) ইমাম সাহেবকে সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, সুন্দর প্রশ্ন। বাচ্চাদের প্রোগ্রামে মাশাআল্লাহ্ আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

নামাযের সময় সামনে দিয়ে যাওয়া

এক বালকের প্রশ্ন ছিল, কেউ নামায পড়া অবস্থায় তার সামনে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলে কতটুকু দূর দিয়ে যেতে হবে। হুযূর (আইঃ) বলেন, অন্ততঃ সিজদার স্থানটুকুর সামনে দিয়ে যাওয়া উচিত। তবে না যাওয়াই ভাল, কেননা এতে নামাযীর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

পুরানো কাগজে কুরআনের আয়াত থাকলে করণীয়

আরেক বালকের প্রশ্ন ছিল, নষ্ট হয়ে যাওয়া বা পুরানো কাগজে যদি কুরআনের আয়াত থাকে তবে তার কী ব্যবস্থা করা উচিত। হুযূর (আইঃ) বলেন, যেন পায়ের নিচে বা এরূপ কোন স্থানে না পড়ে এজন্য একে সম্মানের সাথে জ্বালিয়ে দেয়া উচিত।

নামায ছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ

এ অনুষ্ঠানেরই আরেকটা প্রশ্ন ছিল, নামাযের বাইরে কীভাবে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করা যায়। হুযূর (আইঃ) বলেন, সব সময়ই যিক্‌রে ইলাহীর মাধ্যমে তা সম্ভব।

ক্যানাডার জলসা সালানাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভাষণ

আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে ২০০০ সালের জলসা সালানা ক্যানাডার একটি অধিবেশনের ধারণকৃত অংশ এম. টি. এ. তে প্রদর্শিত হয়। এতে বেশ কয়েকজন মেয়র, মন্ত্রী এবং একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া এ বছর ভহান (Vaughan) শহরে (বায়তুল ইসলাম মসজিদের অতি নিকটে) ২৬০টি বাড়ি বিশিষ্ট একটি আহমদীয়া আবাসিক এলাকার উদ্বোধনকেও তারা স্বাগত জানান। যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন ঃ

১। হার ওয়ার্শিপ লর্না জ্যাকসন (Lorna Jackson), মেয়র, ভহান (Vaughan)

২। হিজ ওয়ার্শিপ ডন কুসেন্স (Don Cousens) মেয়র, মার্কহাম

৩। অনারেবল টনি ক্লেমেন্ট (Tony Clement) অন্টারিও প্রদেশের আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী

৪। অনারেবল জিম পিটারসন (Jim Peterson),কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য এবং সেক্রেটারী অব স্টেট (আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব প্রাপ্ত)

৫। অনারেবল এলিনর কাপলান (Elinor Coplan), নাগরিকত্ব ও অভিবাসন বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

৬। অনারেবল পল মার্টিন (Paul Martin), কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

৭। রাইট অনারেবল জো ক্লার্ক (Joe Clark), সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং কনজারভেটিভ পার্টির দলনেতা

৮। অনারেবল আর্ট এগলটন (Art Eggleton), জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

হুযূর (আইঃ)-এর বাংলাদেশ সফরের বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ

হুযূর (আইঃ)-কে ১৮ই জুলাই ধারণকৃত এবং ২৫শে জুলাই সম্প্রচারিত বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর বাংলাদেশে শুভাগমনের জন্য আমাদের কী করণীয়। হুযূর (আইঃ) বলেন, প্রথম কোন গয়ের আহমদী বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি সম্মানিত এবং সরকারের উচ্চ মহল এমনটি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী যাঁর পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এমন একজন ব্যক্তিকে আমার [হুযূর (আইঃ) -এর] সাথে সাক্ষাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। তাঁর সাথে আমিই আলোচনা করবো এবং বাকি বিষয় ঠিক করা হবে। ইন্দোনেশিয়ার প্রফেসর দোয়াম-এর মত– তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন। এতটা অভিভূত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্‌র ফযলে আমার সফরের সব আয়োজন তিনিই করলেন। আর ইন্দোনেশিয়াতে তো বারবার বাংলাদেশের কথা মনে পড়েছে। পরিপার্শ্বিকতা, আবহাওয়া সবকিছু কাছাকাছি। প্রতি মোড় ঘুরলেই মনে হয়েছে এক পাশে যেন বাংলাদেশ।

ইন্দোনেশিয়া সফরের সময় সেখানকার পরিস্থিতি

এ অনুষ্ঠানেই এ প্রশ্ন করা হয় যে, ইন্দোনেশিয়া সফরের সময় পরিস্থিতি কেমন ছিল এবং মোল্লারা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে কিনা। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, অনেকেই এরূপ আশংকা করেছিলেন। কেউ কেউ এমনটি স্বপ্নও দেখেছেন যে, আমি কোন বিপদের দিকে যাচ্ছি। তদুপরি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণের পর পাকিস্তান ও সৌদী আরব সফর করাতে এ সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। কিন্তু, পরে সব সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্রপতি সম্মানের সাথে আমাকে অভ্যর্থনা জানান। দোয়া, সাহায্য এবং রাষ্ট্র গঠনে আহমদীদের সহযোগী ভূমিকা কামনা করেন। ফলে সর্বত্র বড় বড় কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। উলামার সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে। স্পীকার বড় প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। তেমনিভাবে অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং অনুকূল ভূমিকা রাখেন।

মু'মিনদের মধ্যে রসূলের আগমন

সূরা আলে ইমরানের ১৬৫ আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা মু'মিনদের মধ্যে এক রসূলের আগমনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-তো মু'মিনদের মধ্যে আবির্ভূত হন নি বরং তাঁকে মেনে মানুষ মু'মিন হয়েছেন– তাহলে মু'মিনদের মধ্যে আগমনকারী রসূল কি মসীহ মাওউদ (আঃ)?

হুযূর (আইঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন কখনো কখনো যাদের প্রকৃতিতে মু'মিন হওয়ার Potentiality (সম্ভাব্যতা বা যোগ্যতা) থাকে তাদের জন্যও মু'মিন শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এ আয়াত প্রধানতঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) -এর দিকেই নির্দেশ করছে। আর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দিকেও ইশারা রয়েছে। তবে এখানে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে এটা প্রমাণের জন্য আহমদীদের অত্যুৎসাহিত থাকা ঠিক হবে না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মর্যাদা সর্বাগ্রে রাখা উচিত। অন্যত্রও এ ধরনের ব্যবহার আছে যার শাব্দিক অর্থ করলে ভুল হবে। যেমন সূরা বাকারার শেষ রুকূতে "কুল্লুন আমান্না বিল্লাহে...." (অর্থ সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি.....)। কোথায় সকলে ঈমান এনেছে ?

ইন্দোনেশীয় উলামার প্রকৃতি

হুযূর (আইঃ)-এর কাছে একই অনুষ্ঠানে ইন্দোনেশীয় মোল্লাদের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, হুযূর (আইঃ) বলেন যে, পাকিস্তানী মোল্লাদের থেকে তারা ভিন্ন। তারা প্রথমে তিক্ত প্রশ্ন করে ঠিকই কিন্তু উত্তর দিলে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝুঁকাতে শুরু করে। অপরপক্ষে পাকিস্তানী মোল্লারা সন্তোষজনক উত্তর হলেও না, না করতে থাকে।

জার্মান জাতির বৈশিষ্ট্য

এ অনুষ্ঠানেই জার্মান জাতির বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পরাজয় তাদেরকে শেষ করতে পারে নি। তারা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও দুর্দমনীয় (Resilient) । শেষ করতে গেলে তারা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। অত্যন্ত পরিশ্রমী, পড়াশুনায় একনিষ্ঠ (Studios), দেশপ্রেমিক ও বিশ্বস্ত। অন্য জাতিতে এমন জাতীয়তাবোধ নেই। তৃতীয় বিশ্বে নেতারা নিজ স্বার্থে দেশকে জলাঞ্জলি দেয়; জার্মানরা তা করে না। আহমদীয়ত গ্রহণ করলে তারা এর বিশ্বস্ত সেবক হয়ে যান।

মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নবুওয়তের দাবীতে বিলম্বের হেতু

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ১৯০১ সাল পর্যন্ত কেন নবুওয়তের দাবী করেন নি এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, নিজ বিনয়ের কারণে ইলহামে 'নবী' হিসেবে পূর্বের সম্বোধনকে তিনি স্নেহের চিহ্ন বলে মনে করেছেন। এরপর এক রাতে সারারাত বারবার ইলহাম হতে থাকে যে, তুমি নবী। এরপর এটা তাঁর নিকট স্পষ্ট হয় যে, তাঁকে আল্লাহ্‌তাআলা নবুওয়তের মর্যাদা দান করেছেন (এখানে নবী মানে উম্মতি নবী–**নির্বাহী সম্পাদক**)।

ইন্দেনেশিয়ার এক বিশিষ্ট আলেম

ইন্দোনেশিয়ায় প্রশ্নোত্তর সভায় এক আলেমকে জামাতের অনেক প্রশংসা করতে দেখা যায়। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে এ বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আইঃ) বলেন, তিনি বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিক। আদিতে আইরিশ বংশোদ্ভূত। বিশিষ্ট আলেম এক এলাকার ধর্মীয় প্রধান। তাঁর দায়িত্বাধীন ৬৫টি মসজিদ রয়েছে। পাঁচটি ভাষায় তিনি কথা বলতে পারেন। ইংরেজীর দখল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বার বার বলে, ইসলাম দেখতে হ'লে এখানে (আহমদী জামাতে) দেখো। এটাই হ'ল প্রকৃত ইসলাম।

ইবরাহীম (আঃ)-এর সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি সংক্রান্ত ঘটনা

এ অনুষ্ঠানেরই আরেকটি প্রশ্ন ছিল কুরআনে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঐ ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যেখানে সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদিকে পর্যায়ক্রমে 'রব' মনে করার পর সেগুলো অস্ত যাওয়াতে তিনি প্রকৃত খোদার সন্ধান পান। হুযূর (আইঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ) তো জীবনের কোন একটা দিন প্রথম সূর্য অস্ত যাওয়া দেখেন নি, সূর্য যে অস্ত যায় তা ছোটবেলা থেকেই তাঁর জানা ছিল। তাই এটা কোন নির্দিষ্ট একটা দিনের ঘটনা নয়। বরং এখানে যুক্তির একটা ধারা কেবলমাত্র বিবৃত হয়েছে।

সংকলন –**আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক**

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন

২৪ ও ২৫শে নভেম্বর ২০০০ইং বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ৫ম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা-২০০০ হেলঞ্চাকুরী আহমদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণকারী মজলিসসমূহ হল ঃ আহমদনগর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর, ভাতগাও, ডুহান্ডা, হেলেঞ্চাকুরি, সৈয়দপুর, নিলফামারী, রংপুর ও গাইবান্দা। উক্ত রিজিওনাল ইজতেমায় কেন্দ্র হতে উপস্থিত ছিলেন মোকাররম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, বাংলাদেশ, মোহাম্মদ আব্দুল জলীল, কায়েদ উমুমী, মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, কায়েদ তাজনীদ, মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ্‌, কায়েদ ওয়াকফে জাদীদ এবং সদর মুরব্বী মাওলানা বশীরুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব।

কাদিয়ান সফর ও কিছু ব্যক্তিগত কথকতা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন র‍্যাংকে দুইবার I.S.S.B থেকে Rejected হওয়ার পর মানসিকভাবে কিছুটা কষ্ট পেয়েছিলাম। পড়াশোনাও তেমন মন বসছিল না। দোয়া করছিলাম আর আল্লাহ্‌তাআলার কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম যেন তিনি আমার মনে প্রশান্তি দান করেন। আরো দোয়া করছিলাম যেন, এই প্রশান্তির স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়।

এরই মধ্যে কাদিয়ান জলসায় যাবার জন্যে আবেদনপত্র দেবার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হ'ল। আমি আবেদন করলাম এবং পাসপোর্ট করার জন্য কাগজপত্র তৈরী করলাম কিন্তু আর্থিক কারণে তা আর উঠে নি। এর সাথে একটি কথা যোগ করতে চাই যা আগেই বলা উচিত ছিল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শূরায় সদর সাহেব আমাকে ঢাকা জেলার জেলা কায়েদ হিসাবে অনুমোদন দান করেন। সেদিন ছিল শূরার শেষ দিন। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁকে সেভাবেই বেশি ভেবেছি। কিন্তু সেদিন অর্থাৎ শূরার শেষ দিন যখন তাঁর কাছে দোয়া চাইলাম তখন তিনি বললেন, "দেখ ! Left, Right মানেই জিন্দেগী নয়- আমি দোয়া করব যদি মঙ্গলজনক হয় তাহলে যেন আল্লাহ্ তোমাকে Army তে চান্স দেন।" সেদিন তাঁর কথা আমার উপর এত প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি। এর আগে খোদার কাছে দোয়া করতাম Army তেই যেন আমাকে সুযোগ দেয়া হয়! যদি আমার জন্য এটা মঙ্গলময় না হয় তাহলে যেন মঙ্গলময় করেই খোদা আমায় তা দেন। কারণ এই ক্ষেত্রটা আমার পসন্দের। অর্থ বা নিরাপদ জীবনের জন্য নয় বরং ওই পোশাকটার প্রতি ছিল আমার অসাধারণ দুর্বলতা। কিন্তু সেদিনই শুধু আমি নামাযে এই দোয়া করেছিলাম, "রাযি হ্যা হাম উসিমে জিসমে তেরী রেযা হো"। আমি এত গভীরভাবে সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম যে, যাঁর উপর সরাসরি খোদার খলীফার হাত তিনি কত প্রভাব রাখেন-একটি ছোট্ট কথায় কতবড় হিকমত থাকে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফীক দান করুন, আমীন।

আমি প্রায় নিশ্চিত যে, আমার কাদিয়ান যাওয়া হচ্ছে না। সবার যাওয়ার প্রস্তুতি দেখে আমার মনেও সাধা জাগলো-আমি যাব। কোথা থেকে টাকা আসবে, পাসপোর্টই বা কীভাবে জমা দিব আর আনব এসব না ভেবে আমি নামাযে দোয়া করলাম- "হে খোদা ! আমি নিয়্যত করেছি কাদিয়ান যাবো। কবে যাবো - কীভাবে যাবো তা তুমি জান। তোমার জন্য এটি কোন ব্যাপারই নয় যদি তুমি চাও। তোমার কাছে আমার চাওয়া, তুমি আমায় দারুল আমানে নিয়ে যাবে।"

৫ই নভেম্বর, ২০০০ রবিবার আমার এক নিকটাত্মীয়ের কাছে গেলাম। তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে আমায় কিছু টাকা দিলেন। এর আগে পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে খবর নিলাম, ভারতের Special Passport কিছুদিন আগে থেকে দেয়া হয়েছে। ৬ই নভেম্বর, ২০০০ সোমবার ব্যাংকে টাকা জমা দিলাম। হিসাব মত ঐদিনই আবেদনপত্র জমা দেয়ার কথা। বাসায় এসে ছবি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আগেই ছবি তোলা ছিল তাই আর তুলি নি। কিন্তু ছবিগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। সেদিন আবার ছবি তোলা হ'ল। তোলা নয় ঠিক পূর্বের তোলা ছবি wash করতে দেয়া হ'ল। আরো একদিন পিছিয়ে গেল। ৭ই নভেম্বর, ২০০০ তারিখে পাসপোর্টের কাগজপত্র জমা দিলাম। পাডেল ভাইয়ের সহযোগিতায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ৮ই নভেম্বর, ২০০০ তারিখে বিকাল ৪.১৫ মিনিটে পাসপোর্ট বের করলাম। BRTC তে (ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা) আগেই টিকিটের বুকিং দেয়া ছিল তাই হাতে সময়ও ছিল অপ্রতুল। এক পর্যায়ে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। খোদাতাআলার অশেষ ফযল ও রহমতে আমার অগোছালো সব গুছিয়ে গেল। ৪.১৫ মিনিটে পাসপোর্ট হাতে পেয়ে Dollar endorsed করতে চলে যাই মতিঝিল E-kabir Money Exchange এ। ঠিক ৫টা বাজার ৫ মিনিট আগে সেখানে পৌছাই। যদিও আগে তাঁকে বলা ছিল তাই কবির ভাই সেখানে লোক বসিয়ে রেখেছিল। এই কাজে আমায় সারাদিন সহযোগিতা করেছেন শ্রদ্ধেয় বড় ভাইজান। এরপর ৯ই নভেম্বর, ২০০০ বৃহস্পতিবার ভিসা পাই। রাতে আঞ্জুমানে গিয়ে Jalsa Salana Qadian , 2000 এর Invitation Card সংগ্রহ করে বাসের Reservation Confirm করে বাসায় যাই। বাসায় পৌছতে পৌছতে জ্বর উঠা শুরু হ'ল। দোয়া করছিলাম আর মনে মনে এই সংকল্প ছিল কাদিয়ান আমি যাবোই যাবো। আল্লাহ অবশ্যই আমাকে আরোগ্য দান করবেন। আরেকটি কথা, আমি কিছু ব্যক্তিগত ব্যর্থতার পর ডাইরি লিখা বন্ধ করে দিই। কিন্তু দীর্ঘ ৮ বছরের ধারাবাহিকতা আবার ভিসা পাওয়ার দিন থেকে চালু করি। আল্লাহ্‌র অশেষ ফযল যে, তিনি আমায় রক্ষা করছেন।

ঔষধ সেবন করছিলাম আর সারারাত দোয়া করছিলাম আরোগ্যের জন্য। পরদিন ১০ই নভেম্বর, ২০০০ শুক্রবার সকালেও জ্বর সারে নি। সজীব বাসায় আসলো। তাকে দিয়ে কাপড় ইস্ত্রি, ঔষধ আনয়ন, টুকিটাকি কেনাকাটা, জুতা কালি ইত্যাদি করালাম। সম্পর্কে সে ভাগে হয়। সে আমার সাথে Guest House এ-ও ডিউটি করেছে। অবশেষে বেলা ১২.০০ টার দিকে এবং তারপর আরেকবার বমি হয়। বমি হওয়ার পর থেকে জ্বর কমতে শুরু করে এবং রাতের আগেই সুস্থ হয়ে যাই। তবে সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল ঐদিন আমি জুমআয় যেতে পারি নি। সবার দোয়া নিয়ে রাত ৯.৩০টার বাসে কলকাতার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি। "বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রব্বি লাগফুরুর রহীম।" (চলবে)

-মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব জয়

বেহেশতি মকরেবায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ও খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)-এর কবরের সামনে মোনাজাত ও যিয়ারত রত অবস্থায় মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব (জয়)

ডাঃ হরিলাল বাবুর প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে ঃ

তাঁর উদাহরণ (গ) সূরা আল্ ওয়াকিয়া ঃ ১৫- "এবং পরবর্তীদের মধ্য হতে হবে এক ছোট দল।"

সূরা আল্ ওয়াকিয়া ঃ ৪১ "এবং পরবর্তীদের মধ্য হতেও হবে এক বৃহৎ দল।"

হরিলাল বাবু নির্দিষ্ট করে বিরোধী-তত্ত্বটির উল্লেখ করেন নি। তবে পরবর্তীদের বেলায় একবার 'ছোট দল' আর একবার 'বৃহৎ দল' বলা হয়েছে। তাঁর এ বিষয়টি বিরোধাত্মক বলে মনে হয়ে থাকবে।

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (সঃ)-এর দু'টি আবির্ভাব; একটি প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ (সঃ) হিসেবে আর একটি পরবর্তী যুগে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হিসেবে তাঁর (সঃ) প্রতিনিধি ও প্রতিবিম্বাকারে। সুতরাং ইসলামেরও দু'টি যুগ একটি 'আওওয়ালীন'-দের এবং পরবর্তীটি 'আখারীন'দের যুগ।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের 'পরবর্তী লোকদের দলকে' বুঝাচ্ছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আগমনের প্রায় ৩০০ বছর পরে বক্রতার যুগের লোকদেরকে। ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, কারবালার বিষাদপূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর থেকে মুসলমানদের অবস্থা মন্দ থেকে অধিকতর মন্দ হতে থেকেছে আর তা চরম আকার ধারণ করেছে ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীতে। দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা আখেরী যমানায় আগমনকারী মুহাম্মদী মসীহ্-এর দলকে বুঝাচ্ছে। আজকে মাহ্দী (আঃ)-এর জামাতের এক বৃহৎ দল সারা বিশ্বে ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর প্রকৃত আদর্শের অনুশীলন করছে এবং অন্যদেরকেও এ দিকে আহ্বান করছে। আয়াত দু'টি এদিকেই ইঙ্গিত করছে। সুতরাং এ আয়াতদ্বয়ে কোন বিরোধী-তত্ত্ব নেই।

(ঘ) সূরা ইউনুস ঃ ৪ "নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডল এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন;

প্রশ্ন-উত্তর
কুরআনে বিরোধী-তত্ত্ব নেই

অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই সুপারিশকারী হইতে পারে না। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?"

সূরা আস্ সাজদা ঃ ৫ "আল্লাহ্ তিনি যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সুপারিশকারীও নাই। তথাপি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না।"

এখানেও ডাঃ হরিলাল বাবু কী বিরোধী-তত্ত্ব পেয়েছেন তা সুস্পষ্ট করে বলেন নি। কেবল উদাহরণ দিয়ে নিজ দায়িত্ব সম্পন করেছেন।

কুরআনী শিক্ষানুযায়ী আল্লাহ্তাআলা সার্বভৌম ও অখন্ড ক্ষমতার অধিকারী সর্বোচ্চ সত্তা। তিনিই প্রকৃত শিফায়াতকারী বা সুপারিশ গ্রহণকারী। তাঁর কারও নিকট সুপারিশ করার প্রয়োজনই হয় না আর ঐ আয়াতে তাঁকে অভিভাবকও বলা হয়েছে। সুতরাং তাঁর বেলায় যখন 'শাফী' শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ মনে করতে হবে সুপারিশ গ্রহণকারী। আরবী ভাষায় যাদের জ্ঞান আছে আর ইসলামী আকীদা ও ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে যারা সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন তাদের নিকট এতে বিরোধী-তত্ত্ব পাবার অবকাশ নেই। আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য, এর কোন কোন শব্দ কখনও দু'টি বিপরীত-ধর্মী অর্থও প্রকাশ করে থাকে বা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থও প্রকাশ করে থাকে। যেমন একই 'ইসতাহজিউন' শব্দ মানুষের বেলায় 'উপহাসকারী' ও আল্লাহ্র বেলায় 'উপহাসের শাস্তি দানকারী' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৫-১৬)।

শাফী' শব্দের অর্থ উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারীও করা হয়েছে (তফসীর বায়যাভী)। তাই এই আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধী-তত্ত্ব নেই।

উদাহরণ (ঙ) সূরা আল হিজর ঃ ৮৬ "এবং আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা আমরা যথাযথভাবেই সৃষ্টি করিয়াছি; এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে। সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে মার্জনা কর।"

সূরা তাওবা ৭২ "মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ - সমূহেরও। অধিকন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা।"

এ আয়াত দুটোতে হরিলাল বাবু কী বিরোধী-তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন নি। আমরা এতে কোন বিরোধী-তত্ত্ব দেখতে পাচ্ছি না। তিনি নির্দিষ্ট করে বিরোধী-তত্ত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করলে আমরা পরে উত্তর দিবো, ইনশাআল্লাহ্।

উদাহরণ (চ) ঃ সূরা আল আরাফ ঃ ২৯ "এবং যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহারই আদেশ দিয়াছেন।' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কথা বল যাহা তোমরা জান না।"

সূরা আল্ ইস্রা ঃ "এবং আমরা যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি তখন আমরা ইহার সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশটি দিই – কিন্তু উহাতে তাহারা দুষ্কর্ম করে, তখন উহার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিই।"

এ আয়াত দু'টোতেও হরিলাল বাবু কী বিরোধী-তত্ত্ব পেয়েছেন তা আমাদের সুস্পষ্ট করে জানালে আমরা উত্তর দেবার চেষ্টা করবো, ইন্শাআল্লাহ্। (চলবে)

- নির্বাহী সম্পাদক

সংবাদ

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার প্রথম পুত্র মোঃ আসাদুজ্জামান (শাহীন) আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ রহমতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ হতে "পশু পালন বিষয়ে" অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় First Class পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার আরও উচ্চ শিক্ষার জন্য জামাতের সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ সাজদার রহমান মন্ডল
তাহেরাবাদ, রাজশাহী

শুভ বিবাহ

গত ২৫.৮.২০০০ তারিখ মোসাম্মৎ সাবিনা ইয়াসমিন, পিতা জনাব মোসাদ্দেক মিয়া, গ্রাম-দুর্গারামপুর, পোঃ বীরগাঁও, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে জনাব মোহাম্মদ মানিক মিয়া, পিতা - মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, উত্তর আহমদী পাড়া, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ৭০,০০১/= (সত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন দুর্গারামপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট মোঃ মোখলেসুর রহমান। এই বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

❑ অদ্য শুক্রবার ১-১২-২০০০ তারিখ মোসাঃ ফারহানা ফারুকী (তুরিন) পিতা মরহুম আবদুল আলীম, ১৯৮ শান্তিবাগ (ইষ্টান লিং, রুম-১০২) ঢাকা এর সাথে জনাব মোহাম্মদ ফজলে হক, পিতা মরহুম সহিদুল হক, সবুজপাড়া, (পো+জেলা - নীলফামারী - এর বিয়ে ৮৭০০১/- (সাতাশি হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সম্পন্ন হয়। বিয়ের এলান ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

আব্দুর কাদের ভূঁইয়া
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা

❑ গত ২৮/১০/২০০০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব মোসাঃ আঞ্জুমানরা পারভীন, পিতা এম, আমিনুর রহমান, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সহিত মোঃ লিয়াকত হোসেন সাথে, পিতা- আবদুস সাত্তার খাঁ গ্রাম- ঘড়িলাল, পোঃ চরামুখা, কয়রা খুলনা-৩০,০০১/= (ত্রিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান ও দোয়া পরিচালনা করেন মৌঃ এনামুল হক রনি (মোয়াল্লেম)। এই বিবাহ বাবরকত হবার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট আন্তরিক দোয়ার আবেদন রইল।

❑ গত ২০/১১/২০০০ইং তারিখ সোমবার বাদ জোহর মোসাঃ মনিরা পারভীন, পিতা মজিবর রহমান গাজী, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে মোঃ আশাউল হোসেন, পিতা- মোঃ নওশের আলী গাজী এর ১৪,৯৯৯/= (চৌদ্দ হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানা ধার্যে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ ও দোয়া পড়ান শেখ মাহফুজুর রহমান (জেনারেল সেক্রেটারী)। এই বিবাহ বরকতময় হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

সাইদুর রহমান
সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

শোক সংবাদ

আমাদের মাতা মরহুমা আলম চাঁন নেছা প্রায় ৮৯ বৎসর বয়সে নিজ বাড়ী দেওয়ানটুলী, মাহীগঞ্জ, রংপুর গত ১লা ডিসেম্বর ৪ঠা রমযান রোজ শুক্রবার সকাল ৮ ঘটিকার সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে .. রাজেউন)।

তিনি ১৯৩৬ইং আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন। তার স্বামী মরহুম মুন্সী আব্দুল হামিদ আহমদীয়তের কারণে ভীষণ মোখালেফাতের মধ্যে দিন কাটান; কিন্তু মরহুমা সব সময় জামাতের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত ছিলেন। ইহা ছাড়া জামাতের যে কোন মেহমান তার বাড়ী গমন করতেন তাকে আপ্যায়ন না করে বিদায় দিতেন না। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবা এবং ন্যাশনাল আমীর ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় তিনি নিঃস্বার্থভাবে শ্রম দিতেন।

মরহুমা মমতাজ উদ্দিন আহমদ সহ ৬ ছেলে ২ মেয়ে ও অনেক নাতী, নাতনী রেখে গিয়েছেন। আমি সকল আহমদীর নিকট আমার মাতার রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

খুরশীদ আহমদ
সেক্রেটারী মাল
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ

❑ গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, দক্ষিণ মোড়াইল (মীরবাড়ী) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী মরহুম মীর আবদুস সাত্তার সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র জনাব সৈয়দ আবদুল আওয়াল (Deed writer) বিগত পহেলা ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকার সময় আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোকগমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই মেয়ে, দুই বোন এবং এক ভ্রাতা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

মরহুম প্রবীনতম আহমদী পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

শেখ আবদুল আলী
যয়ীমে আলা, মজলিসে আনসারুল্লাহ,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا
لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাসহীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own.

with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের তবলীগী ও তরবীয়তী কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন

বীরপাইকশা জামাতে ৩ দিন ব্যাপী তালীম-তরবীয়তি ক্লাসের পর ১৭ নভেম্বর ২০০০ইং বাদ জুমুআ তবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র হতে উপস্থিত ছিলেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর -২, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, সেক্রেটারী ওসিয়্যত ও আহবায়ক, আঞ্চলিক তবলীগী টিম এ. কে. রেজাউল করীম ও সেক্রেটারী জিয়াফত, সামছুল হক এবং স্থানীয় জামাতের সদস্যবর্গ।

বগুড়া মসজিদে রাজশাহী অঞ্চলের জামাতসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে জামাতী কার্যক্রমের উপর আলোচনারত মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত এবং মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ

বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার জামাতসমূহের প্রেসিডেন্ট ও কর্মকতা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিবর্গ

New Vol. No. 63 ❑ 11th & 12th Issue
December 15, 2000 ❑ Tk. 15.00
Fortnightly
The AHMADI
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

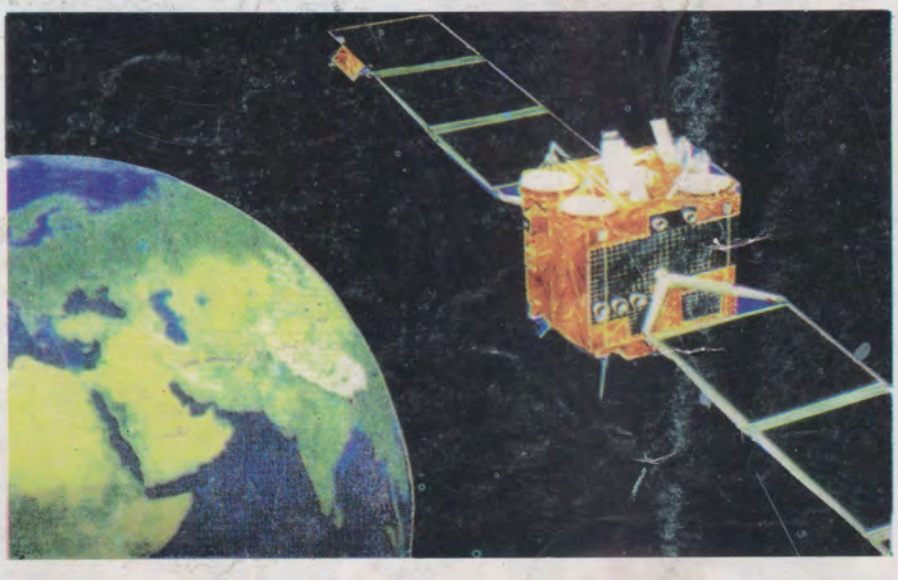

Muslim TV AHMADIYYA International

MTA AUDIO CHANNELS		
* Main	:	6.50 MHz
* English	:	7.02 MHz
* Arabic	:	7.20 MHz
* Bangla	:	7.38 MHz
* French	:	7.56 MHz
* German	:	7.74 MHz
* Indonesian	:	7.92 MHz
* Turkee	:	8.10 MHz

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান বাংলা ভাষী দর্শকদের জন্য
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে খুতবা পুনঃপ্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA-এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ-এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

MTA-তে প্রত্যেক মঙ্গলবার হুযূর (আইঃ)-এর প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাভাষী দর্শক - শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন আহবান করা যাচ্ছে। নিম্ন ঠিকানায় প্রশ্ন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272